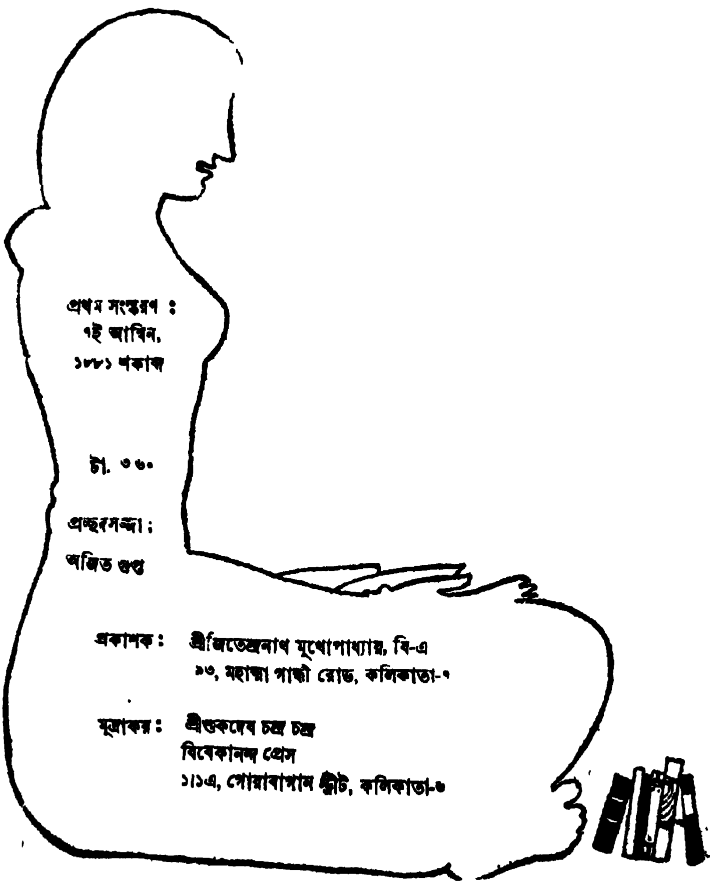
গোয়েন্দা, ভূত ও মানুষ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭



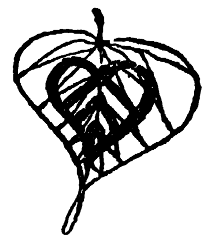
প্রথম সংস্করণ :
৭ই আশ্বিন,
১৮৮১ শকাব্দ

টা. ৩৬০

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীশুকদেব চন্দ্র চন্দ্র
বিবেকানন্দ প্রেস
১।১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬





নিতান্ত হালকা মামলা	...	১
পলাতক চায়ের পেয়ালা	...	২৬
পৃথিবীর প্রথম গেয়েন্দা-কাহিনী	...	৩৪
সত্যিকার গোয়েন্দাদের গল্প	...	৪০
সূত্র কুত্র ?	...	৪৮
মুক্তি	...	৫৬
পেপির দক্ষিণ পদ	...	৬৪
পোড়ো বাড়ী	...	৭০
ভৌতিক, না ভেল্কি	...	৭৭
কিসমৎ ?	...	৮১
ভৌতিক চক্রান্ত	...	৮৭
জঙ্গলের নাট্যাভিনয়	...	৯৪
বংশীবদনের বহির্গমন	...	১০০

নিতান্ত হালকা মামলা

ফুরিয়ে গিয়েছে প্রাতরাশের পালা। সাঙ্গ হয়েছে সংবাদপত্র পাঠ। জয়ন্তের ইচ্ছা বাঁশী সাধে। মাণিকের সাধ দুই-এক চাল দাবা খেলে। এমন সময়ে কালীবাবুর প্রবেশ। দুজনেরই সাধে পড়ল বাদ।

বাবু কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। দক্ষিণবঙ্গের একজন বড় জমিদার। কিন্তু একরকম স্থায়িভাবেই শিকড় গেড়েছেন কলকাতায়। জয়ন্তদের পাড়ার লোক এবং প্রায় বন্ধুও বটে। বয়স ষাটের কম হবে না। মাথার চুল কার্পাস তুলোর মত ধবধবে। কিন্তু গায়ের টকটকে রঙের জেল্লা এখনো ময়লা হয় নি এবং লম্বা চওড়া দেহখানিও বেশ শক্তসমর্থ। একাধিক জ্যোতিষী রজত মুদ্রার বিনিময়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, অন্ততঃ পঁচাশী বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি যে-কোন যমদূতকে কদলী প্রদর্শন করতে পারবেন এবং সেইজন্যে বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয়পক্ষের পক্ষপাতী হয়েও কালীবাবু দিব্য সপ্রতিভ মুখে নিষ্করুণ পৃথিবীর বক্রদৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারেন।

পরমায়ুর বাকি এখনো সিকি শতাব্দী—সে তো বহুকালের ব্যাপার! বয়সে বিয়ে করেছি তো হয়েছে কি? দীর্ঘজীবীকে আবার বুড়ো বলে খোঁটা দেওয়া কেন বাপু? কালীবাবুর মনের ভাবখানা হচ্ছে এই রকম। জ্যোতিষীদের কথায় তাঁর অটল নির্ভরতা।

মাণিক কিঞ্চিৎ বিস্মিত স্বরে বলে উঠল, 'আরে কালীবাবু যে! ভোরবেলা তো আপনার কাছে অবেলা! এমন অসময়ে বৌদির রঙিন আঁচল ছেড়ে আমাদের মত চিরকুমারদের খাস্তা আস্তানায় কেন?'

কিন্তু জয়ন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কালীবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে বললে, 'আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি যেন অসুস্থ।'

কালীবাবুর প্রফুল্ল মুখে অসুস্থতার ছাপ কেউ দেখে না। জয়ন্তের বিস্ময়ের কারণ আছে।

কালীবাবু অবসাদগ্রস্তের মত একখানা চেয়ারের উপরে অঙ্গভার ন্যস্ত করে বললেন, 'হ্যাঁ জয়ন্তবাবু, আমি অসুস্থ। কিন্তু দেহের নয়, মনের অসুখ।'

সরকার সব জমিদারী হস্তগত করবেন বলে আজকাল কোন জমিদারেরই মন সুস্থ নয়। কালীবাবু কি তাই—

জয়ন্তের চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে কালীবাবু হঠাৎ বললেন, 'জয়ন্তবাবু, শুনেছি আপনারা সখের গোয়েন্দাগিরি করতে ভালোবাসেন। আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবেন!'

জয়ন্ত অল্পক্ষণ নির্বাক হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'আপনাকে আমরা কোন্ দিক দিয়ে সাহায্য করতে পারি? আপনার কি কিছু চুরি গিয়েছে?'

কালীবাবু বিমর্ষভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'চুরি? না, আমার কিছুই চুরি যায় নি। চুরি গেলে আমি এতটা চিন্তিত হতুম না, আর সরকারী পুলিস থাকতে আপনাদের বিরক্ত করতেও আসতুম না।'

—'তবে?'

—'এই চিঠিখানা পড়ে দেখুন। এখানা কাল বৈকালে পেয়েছি।' কালীবাবু নিজের পকেট থেকে একখানা খাম বার ক'রে জয়ন্তের দিকে এগিয়ে দিলেন।

কালীবাবুর ডান হাতের দিকে চেয়ে জয়ন্ত বললে, 'আপনার বুড়ো-আঙ্গুল আর তর্জনীর উপরে পটি বাঁধা কেন?'

—'একটা ঘরের দুই দরজার মাঝখানে প'ড়ে কাল বড়ই চোট

লেগেছে। ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। আজ আর আঙুল দুটো নাড়তে পারছি না। কিন্তু ও-কথা নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। চিঠিখানা আগে পড়ে দেখুন।'

খামের দিকে তাকিয়েই জয়ন্তের চোখ একটু চমকে উঠল। তার উপরে হাতের লেখা নেই, ছাপা বই থেকে কতকগুলো অক্ষর কেটে নিয়ে পরে পরে বসিয়ে কালীবাবুর নাম ও ঠিকানা লেখা হয়েছে। সাধারণ সরকারী খাম, আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্ট-আফিসের ছাপ মারা।

খামের ভিতরের কাগজও চিঠির কাগজ নয়. সাধারণ ফুলস্ক্যাপ কাগজের আধখানা কেটে নিয়ে মাঝখানে ভাঁজ করে ব্যবহার করা হয়েছে। চিঠির কথাগুলোও মুদ্রিত পুস্তকের অক্ষব কেটে নিয়ে বসানো।

কথাগুলো এই:

২০।৮।৫৪

"শ্রীকালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী

সমীপেষু

মহাশয়,

আমার স্ত্রী মাধবী বিধবা নয়। আমিই তার বৈধ স্বামী এবং বলা বাহুল্য আজও বহাল-তবিয়তে সশরীরে বিদ্যমান। স্বামী বর্তমান থাকতে হিন্দু স্ত্রীর দ্বিতীয়বার বিবাহ হতে পাবে না, অথচ শুনছি আমার স্ত্রীকে আপনি আবার 'বিবাহ' করেছেন। এটা যে গুরুতর অপরাধ, আশা করি আপনি তা স্বীকার করবেন।

এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যে আমি শীঘ্রই আপনার সঙ্গে দেখা করব। ইতি—

নিবেদক

শ্রীমহীতোষ সেন

পত্রখানা পাঠ ক'রে জয়ন্ত নীরবে কালীবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

কালীবাবু বললেন, 'আমার বিবাহের ব্যাপার নিশ্চয় আপনার অজানা নেই?'

না, জয়ন্তের তা অজানা নেই। ব্যাপারটা হচ্ছে এই:

নিঃসন্তান অবস্থায় কালীবাবুর প্রথম সহধর্মিণী পরলোকে গমন করেন ১৯৪০ খৃস্টাব্দে। বিপুল বিত্তের মালিক হয়েও সন্তানের অভাবে কালীবাবুর দুঃখের সীমা ছিল না। তাঁর তারাপ্রসন্ন নামে এক ভ্রাতুষ্পুত্র আছে বটে, কিন্তু তার নাম তিনি মুখেও আনেন না। সে হচ্ছে মদ্যপ, জুয়াড়ী ও অকর্মণ্য; নিজের সমস্ত সম্পত্তি অনায়াসে উড়িয়ে দিয়েছে খোলামকুচির মত এবং কালীবাবুও তাকে আর নিজের বাড়িতে ঠাঁই পর্যন্ত দিতে রাজী নন। যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল অশান্তিময়। অবশেষে অনেক ভেবেচিন্তে ও বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শ নিয়ে ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে তিনি বিধবা মাধবী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

তখন মাধবীর বয়স কুড়ি বৎসর এবং কালীবাবু পঞ্চাশের কোঠা পার হয়ে গিয়েছেন। সুতরাং বর-কন্যার এই মিলন যে রাজযোটক ব'লে গণ্য হয়নি, সে কথা বলা বাহুল্য। ভার্যার সার্থকতা পুত্রের জন্যই, অনেকের কাছে শাস্ত্রবাক্য আউড়ে কালীবাবু তা প্রমাণিত করতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু শাস্ত্রের নির্দেশ পালনের জন্যই যে তিনি পুনর্বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, এটা একেবারে পূর্ণ সত্য না হ'তেও পারে। কেবল যুবতী নয়, মাধবী ছিল পরমা সুন্দরী।

এই অসম-মিলন মাধবী কিভাবে গ্রহণ করেছিল, বাইরে তা প্রকাশ পায়নি। কিন্তু সে বুদ্ধিমতীরই মত মুখে কোন প্রতিবাদ

করেনি, কারণ প্রতিবাদ করবার যোগ্যতা তার ছিল না। শৈশব থেকেই সে বাপ-মা-হারা, দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘরে অনাদরে মানুষ : তার উপরে প্রথম যৌবনেই স্বামী হারিয়ে তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল অনাথ-আশ্রমে ; অতএব এখানে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন উঠতেই পারে না ; বরং বলা যায় যে, এই দ্বিতীয় বিবাহটা তার পক্ষে হয়ে দাঁড়িয়েছিল শাপে বরের মত, কারণ কালীবাবু যুবক না হ'লেও ধনকুবের।

তার বৈধব্যের পিছনেও আছে একটুখানি ইতিহাস। ১৯৪০ খৃস্টাব্দে মহীতোষ সেনের সঙ্গে যখন তার বিবাহ হয়, তখনও সে হয়নি উদ্ভিন্নযৌবনা। বিবাহের অল্পদিন পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ফৌজে চাকরি নিয়ে মহীতোষ মিশরে চলে যায়। তারপর ১৯৪১ খৃস্টাব্দে মিশর থেকে সরকারী খবর আসে যে, কোন একটা যুদ্ধের পর থেকে মহীতোষ সেন 'মিসিং,' অর্থাৎ নিখোঁজ। তারপর একে একে কয়েক বৎসর কেটে যায়, কিন্তু তার আর কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি। অতএব স্বাভাবিকভাবেই সকলে ধরে নেয় যে, মহীতোষ আর ইহলোকে বর্তমান নেই। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিখোঁজ হওয়ার অর্থ দাঁড়ায় যে মৃত্যু, এইটেই দেখা গিয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

কিন্তু ১৯৪১ খৃস্টাব্দ থেকে নিখোঁজ মহীতোষের আত্মা যে এখন প্রেতলোকে বাস করছে না, ১৯৫৪ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে লিখিত তার পত্রে সেই সত্যটাই প্রমাণিত হচ্ছে। বিস্ময়ের কথা, কিন্তু অসম্ভব নয়। পাশ্চাত্য দেশে অগুন্তিবার দেখা গিয়েছে এমন ব্যাপার।

দুই

জয়ন্ত মনে মনে ভাবতে লাগল, ব্যাপারটা রীতিমত নাটকীয় হয়ে উঠেছে। বাঙ্গালী জীবনে এমন ঘটনা সহসা ঘটে না।

কালীবাবু বললেন, 'আমি এখন কি করব ?'

মাণিক বললে, 'কি করা উচিত, তার কিছুই কি আপনি স্থির করতে পারেন নি ?'

কালীবাবু বললেন, 'আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি। আর সেইজন্যেই তো আপনাদের সাহায্য চাই।'

জয়ন্ত শুধোলে, 'কিন্তু কি-রকম সাহায্য ?'

—'এই পত্রখানা দেখে আপনার কি মনে হয় ?'

—'আর পাঁচজনের যা মনে হতে পারে তাই। অর্থাৎ বিশেষ কিছুই নয়। প্রথমতঃ পত্রলেখক নিজের হস্তাক্ষর গোপন করতে চায়। দ্বিতীয়তঃ লেফাফা সরকারী, কাগজেও কোন বিশিষ্টতা নেই ; এর 'ওয়াটার মার্কে' পাওয়া যায় বটে—Howard Smith, Bellfast Bond, Made in Canada. কিন্তু এও হচ্ছে খুব সাধারণ—'

কালীবাবু বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও ঐ মার্কা-মারা ফুলস্ক্যাপ কাগজ ব্যবহার করি।'

জয়ন্ত ভ্রূ-সঙ্কুচিত ক'রে বললে, 'তাই নাকি ? আপনিও ঐ একই কাগজ ব্যবহার করেন ?' তারপর অল্পক্ষণ স্তব্ধ থেকে সে বললে, 'তাহ'লেই বুঝুন, এ রকম কাগজ আপনি ব্যবহার করেন, আমি ব্যবহার করতে পারি, আবার আরো অনেকেও ব্যবহার করতে পারেন। তাই বলছিলুম, কাগজেও কোন বিশিষ্টতা নেই।'

মাণিক বললে, 'কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আন্দাজ করা

যেতে পারে। পত্রলেখক নিজের ঠিকানা দেয়নি। সে নিজের হাতের লেখাও কারুকে দেখাতে চায় না। এ লুকোচুরির কারণ কি?'

কালীবাবু বললেন, 'অথচ সে নিজেকে আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চায় না, কারণ সে নাকি শীঘ্রই আমার সঙ্গে দেখা করবে। সুতরাং কোন রকম লুকোচুরিই এখানে যুক্তিহীন ব'লে মনে হয় নাকি?'

জয়ন্ত বললে, 'এ ব্যাপারটা নিয়ে আমিও মনে মনে মাথা ঘামাচ্ছি। চিঠিখানা লিখেছে নিশ্চয়ই কোন মতলববাজ লোক। আমার সন্দেহ হয়, লোকটার মনে বিশেষ কোন মন্দ অভিসন্ধি আছে, কিন্তু সেটা যে কি, তা বুঝে উঠতে পারছি না।'

মাণিক বললে, 'চিঠিখানার ধরন-ধারণ অনেকটা উড়োচিঠির মত। উড়োচিঠি প্রায়ই ভিত্তিহীন হয়।'

কালীবাবু বললেন, 'কিংবা কেউ হয়তো আমাকে ব্ল্যাকমেল করবার ফিকিরে আছে।'

জয়ন্ত বললে, 'তাও অসম্ভব নয়।'

—'কিন্তু এ সবই তো আন্দাজী কথা। আমি আপনাদের কাছে এসেছি একটা নিশ্চিত নির্দেশ পাবার আশায়।'

—'কালীবাবু, এত তাড়াতাড়ি নিশ্চিতভাবে কিছু বলা চলে না। আমাকে একটু ভাববার সময় দিন। মনে হচ্ছে, একটা পথও যেন খুঁজে পেয়েছি। আমরা কাল সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করব। সেই সময়ে হয়তো কোন কোন কথা বলতে পারব।'

তিন

পরদিন প্রভাতে যথাসময়ে কালীবাবুর বাড়ির দিকে পদচালনা করলে জয়ন্ত ও মাণিক।

মাণিক শুধোলে, 'কাল দুপুরে তুমি কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলে? আমি এসে ফিরে গিয়েছি।'

—'গিয়েছিলুম সৌরীনের কাছে, কলেজের সৌরীন মিত্রের কথা তোমার মনে আছে?'

—'সৌরীন মিত্র? এক সৌরীন মিত্র তো আমাদের সঙ্গে 'ফোর্থ ইয়ার' পর্যন্ত প'ড়েছিল। তুমি কি তার কথা বলছ?'

—'হ্যাঁ, সেই-ই। আমি জানতুম, সৌরীনের এক ভাই বারীন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে পল্টনে যোগ দিয়ে উত্তর-আফ্রিকায় গিয়েছিল। তার সঙ্গেই ছিল আমার দরকার।'

মাণিক বিস্মিত স্বরে বললে, 'তার সঙ্গে তোমার কি দরকার থাকতে পারে?'

—'বিশেষ কিছুই নয়। আমি খালি জানতে গিয়েছিলুম, ফৌজে মহীতোষ সেন নামধারী কোন ব্যক্তির সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল কিনা?'

মাণিক ব'লে উঠল, 'অহো, বুঝেছি!…তারপর কি জানতে পারলে?'

—'জানলুম, মহীতোষ সেন নিখোঁজ হলেও যুদ্ধে মারা পড়েনি।'

—'তারপর?'

—'ব্যাপারটা আর একটু ফলাও ক'রে বলছি, শোনো। মহীতোষের কথা তুলতেই বারীন উত্তেজিতভাবে বলে উঠল—

'ব্ল্যাকগার্ড। সে ভারতের বাইরে বাঙালীর নাম ডোবাতে চেয়েছিল!' আমি বললুম—'কেন?' বারীন বললে—'লড়াই শুরু হ'তেই সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কাপুরুষের মত পালিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে এটা জানা যায়নি, তাই তার নাম বেরিয়েছিল নিখোঁজদের তালিকায়। তারপর সব কথা প্রকাশ পায়, তাকে নিয়ে খোঁজাখুঁজি চলে, কিন্তু তার নাগাল পাওয়া যায় না। ধরা পড়লে 'ডিজার্টার' ব'লে সামরিক আদালতে নিশ্চয়ই তার কঠিন শাস্তি হ'ত। বুঝেছ মাণিক! এতদিন পরে সেই বীরপুরুষই দুষ্টগ্রহের মত আবির্ভূত হয়েছেন বেচারা কালীবাবুর ভাগ্য-গগনে!'

—'হুঁ। ব্যাপারটা দেখছি বড়ই ঘোরালো হ'য়ে উঠল।'

—সৈনিকবেশে বারীন আর অন্য দুই বন্ধুর সঙ্গে তোলা মহীতোষের একখানা ফটোও আমি সংগ্রহ করেছি। ভবিষ্যতে সেখানা কাজে লাগতে পারে।

—'বিশেষ কাজে লাগবে ব'লে মনে হয় না। ভারত আজ স্বাধীন, আর মহীতোষ ছিল ইংরেজ আমলের সেপাই। 'ডিজার্টার' ব'লে এখন কেউ তাকে গ্রেপ্তার করতে চাইবে কি?'

—'বোধহয় না। আর সেইজন্যেই তো এতদিন পরে এই কাপুরুষ আত্মপ্রকাশ করতে সাহসী হয়েছে।'

—'কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাচ্ছি না। আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যত হয়েও সে নিজের ঠিকানা আর হাতের লেখা লুকোতে চায় কেন?'

—'ঠিক বলেছ। এর মধ্যে যেন কোন শয়তানির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখন একথা চাপা দাও, এই আমরা কালীবাবুর বাড়ির কাছে এসে পড়েছি।'

চার

জয়ন্ত ও মাণিক সচমকে দেখলে, কালীবাবুর দরজার সামনে ছোট এক জনতা। তার মধ্যে আবিষ্কার করা যায় একাধিক লাল-পাগড়ীকেও।

মাণিক সবিস্ময়ে বললে, 'এখানে আবার পুলিশ হাঙ্গামা কেন?'

ঠিক সেই সময়ে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন ইনস্পেক্টর ভূপেন চক্রবর্তী। মেদদোষাক্রান্ত, কিন্তু দশাসই চেহারা। ভারিক্কে চালচলন, উপরিতন কর্মচারী ছাড়া দুনিয়ার আর সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন কৃপালু নেত্রে। জয়ন্ত ও মাণিক তাঁকে চিনত, কারণ কোন কোন মামলায় তাদের পুরাতন বন্ধু ও পরামর্শপ্রার্থী ডিকেটটিভ ইনস্পেক্টর সুন্দরবাবুর সঙ্গে ভূপেনবাবুর দেখা পাওয়া গিয়েছে কয়েকবার।

তাদের দেখেই ভূপেনবাবু ব'লে উঠলেন, 'আরে, আরে, একি ব্যাপার? মড়া পড়তে না পড়তেই শকুনির টনক নড়ে?'

জয়ন্ত অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললে, 'মশায়ের উপমাটার অর্থ বুঝলুম না।'

—'অর্থটা কি এতই দুর্বোধ্য? হা হা হা হা! কিন্তু গোড়াতেই জেনে রাখুন মশাই, সুন্দরবাবুর মত আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী নই—নিজের মামলার ভার আমি নিজেই বহন করতে পারি। আর তা ছাড়া এটা একটা মামলার মত মামলাই নয়, এ হচ্ছে নিতান্ত হাল্কা মামলা, যে-কোন শিশুও এর তদ্বির করতে পারে।'

জয়ন্ত বললে, 'আপনি কী সব বাজে বকছেন? আমরা কোন মামলার ভার নেবার জন্যে এখানে আসিনি। কালীবাবু ডেকেছেন, তাই আমরা এসেছি। আমরা তাঁর বন্ধু।'

—'কালীবাবু আপনাদের ডেকেছেন ? কিন্তু তিনি এখন কোথায় ?'

—'কেন, তিনি কি বাড়িতে নেই ?'

—'বাড়িতেও নেই, পৃথিবীতেও নেই।'

—'মানে ?'

—'কাল রাত্রে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।'

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে জয়ন্ত ও মাণিক একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তাদের মন একথা বিশ্বাস করতে চাইলো না এবং তাদের মৌন মুখের উপরেও ফুটে উঠল সেই মনের কথা।

ভূপেনবাবুর শিক্ষিত দৃষ্টি সে কথাটা বুঝতে ভুল করলে না। ওষ্ঠাধর টিপে মৃদু হেসে তিনি বললেন, 'যা ভাবছেন, তা নয়। কালীবাবু যে আত্মহত্যা করেছেন তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই।'

ততক্ষণে জয়ন্ত নিজেকে সামলে নিয়েছে। কালীবাবুর অভাবনীয় অপঘাতের সংবাদ পেয়ে সাধারণ লোকের মত তারও মন প্রথমটা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তারপরই জাগ্রত হয়ে উঠল তার তীক্ষ্ণধারনিশিত গোয়েন্দা-বুদ্ধি—যে-কোন পরিস্থিতির মধ্যে যা থাকে সর্বদাই অবিচল ও অবিভ্রান্ত। সে বেশ সহজভাবেই বললে, 'মৃতদেহ কি এর মধ্যেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে ?'

—'না, উপরওয়ালাদের আদেশের অপেক্ষা করছি।'

—'বলেছি, কালীবাবু ছিলেন আমাদের বন্ধু। শেষবারের জন্যে একবার তাঁকে দেখতে পাব কি ?'

আবার ঠোঁট টিপে একটু হেসে ভূপেনবাবু বললেন, 'এ সব জায়গায় বাইরের বাজে লোকের প্রবেশ নিষেধ। তবে আপনি পরিচিত ব্যক্তি, অতএব আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এখানেও যেন সখের গোয়েন্দাগিরি ক'রে আপনি আমার উপরে টেক্কা মারবার

চেষ্টা না করেন, কারণ আমি সুন্দরবাবু নই। আমি বলছি এটা আত্ম-হত্যার মামলা, সব দেখে-শুনে আপনাকেও আমার কথা মানতে হবে।'

জয়ন্ত বললে, 'ঘাবড়াচ্ছেন কেন, তাই সই।'

ভূপেনের পিছনে পিছনে জয়ন্ত ও মাণিক ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

সেটা হচ্ছে কালীবাবুর একাধারে বসবার ও পড়বার ঘর। আকারে বড়ই বলতে হবে। তিনদিকের দেওয়াল আড়াল ক'রে সারি সারি বইভরা আলমারি। যেদিকে দেওয়াল-ঢাকা আলমারি নেই সেইদিকে তিনটি জানলা ও ঘরে ঢোকবার জন্যে একটি মাত্র দরজা। ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিল ও তার তিনদিকে চারখানা ও একদিকে একখানা চেয়ার। টেবিলের উপরে লেখবার 'প্যাড', দেয়াতদান, কলমদান, কাগজ-চাপা, খানকয় বই ও অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস।

ঘরের এক কোণে একটা টাইপরাইটারের ছোট টেবিলের উপরে টাইপ করার যন্ত্র। জয়ন্ত জানত, সেটা হচ্ছে কালীবাবুর বাংলা টাইপরাইটার, তিনি নিজে ব্যবহার করতে ভালোবাসতেন।

বড় টেবিলের একপাশে কিছু তফাতে একখানা ইজি-চেয়ার এবং তারই উপরে দেখা যাচ্ছে অর্ধশয়ান অবস্থায় হতভাগ্য কালীবাবুর মৃতদেহ। তাঁর মাথাটি বাঁ-কাঁধের উপর লুটিয়ে পড়েছে এবং ডান রগের উপরে একটা গভীর, ভীতিকর ও রক্তাক্ত ক্ষত। মুখ ও বুকের কতক অংশের উপরে ও চেয়ারের একদিকে রক্ত জমাট বেঁধে আছে এবং মেঝের উপরেও রয়েছে চাপ চাপ রক্ত। ইজি-চেয়ারের চ্যাটালো হাতলের উপরে প'ড়ে আছে তাঁর ডান বাহুখানা এবং সেই হাতের মুষ্টির মধ্যে রয়েছে একটা রিভলভার—ট্রিগারের উপরে তখনো সংযুক্ত রয়েছে মৃতের তর্জনীটি।

কালীবাবুর চোখ দুটি খোলা এবং তাদের মধ্যে তখনো আড়ষ্ট হয়ে আছে বিস্ময়ের মত একটা ভাব—জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করবার জন্যে যুক্তিহীন মৃত্যু যে এমন আকস্মিকভাবে তাঁকে আক্রমণ করবে, যেন তিনি তার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। জয়ন্তের মনে হ'ল এ চোখ যেন আত্মঘাতীর চোখ নয়।

কিন্তু ভূপেনের তা মনে হয় নি। তিনি অঙ্গুলি নির্দেশে বললেন, 'দেখছেন ক্ষতের চারদিকে পোড়া দাগ? তার মানে কালীবাবু রিভলভারের নলচেটা একেবারে নিজের রগের উপরে রেখে টিপকল টিপে দিয়েছিলেন।'

মুখে খালি 'হুঁ' বলে জয়ন্ত হেঁট হয়ে প'ড়ে খরচোখে কালীবাবুর হাতটা কিছুক্ষণ পরীক্ষা করলে। তারপর বললে, 'পরশু দিন কালীবাবুর অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীর উপরে বিষম চোট লেগেছিল, এখনো তার চিহ্ন জাজ্বল্যমান। কাল দেখেছিলুম আঙুল দুটোর উপরে পটি বাঁধা রয়েছে—'

ঘরের দরজার কাছ থেকে নূতন গলার আওয়াজ এল—'রিভলভারের ঘোড়া টেপবার আগে কালীবাবু নিশ্চয়ই সেটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। ঐ দেখুন, ঘরের কোণে ব্যাণ্ডেজটা এখনো প'ড়ে রয়েছে।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মূর্তি। বয়স হবে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। রং উজ্জ্বল। মুখশ্রী বিশেষত্ববর্জিত হ'লেও দেখতে মন্দ লাগে না। মাথায় পরিপাটি ক'রে আঁচড়ানো লম্বা চুল, জোড়া ভুরু, ওষ্ঠের উপরে চার্লি-চ্যাপলিন গোঁফ। ডান গালে একটা বড় আঁচিল সহজেই চোখে পড়ে। জামাকাপড় বাবুয়ানার পরিচয় দেয়। দেহ দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসু চোখে ভূপেনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

ভূপেন বললেন, "ইনি হচ্ছেন মতিলাল মজুমদার, কালীবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারি, বাসা এই বাড়িতেই। কাল রাত এগারোটার সময়ে রিভলভারের শব্দ শুনে ছুটে এসে উনিই প্রথমে জানতে পারেন, কালীবাবু আত্মহত্যা করেছেন।"

মতিলালের মুখের পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভূপেনের জবানীতে জয়ন্ত তার পরিচয় শ্রবণ করলে। তারপর তার নমস্কারের উত্তরে প্রতিনমস্কার ক'রে সে ঘরের কোণে এগিয়ে গিয়ে মেঝের উপর থেকে তুলে নিলে পরিত্যক্ত ব্যাণ্ডেজটা।

ব্যাণ্ডেজের খানিকটা অংশ রক্তের ছোপে আরক্ত।

জয়ন্তের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে ফিরে মাণিকের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করলে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'ভূপেনবাবু, আত্মহত্যার কোন কারণ আপনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন?'

যেন কেল্লা ফতে করেছেন এমনি ভাব দেখিয়ে ভূপেনবাবু বললেন, "পেরেছি বৈকি! এই চিঠিখানা দেখুন, এখানা ছিল বড় টেবিলটার উপরে। এই একখানা চিঠিই আত্মহত্যার পক্ষে যথেষ্ট।"

সেই চিঠি—ছাপার অক্ষর কেটে নিয়ে যা লেখা হয়েছে।

জয়ন্ত চিঠিখানা যেন দেখেও দেখলে না। বললে, "আর কোন সূত্র পেয়েছেন?"

—"পেয়েছি বৈকি, সবচেয়ে বড় সূত্র। এদিকে আসুন।" ভূপেনবাবুর মুখে মহা গাম্ভীর্যের ভাব।

পাঁচ

ভূপেনবাবু কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে বাংলা টাইপরাইটারের টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "দেখুন।"

তখনও টাইপরাইটারের সঙ্গে সংলগ্ন রয়েছে একখানা 'টাইপ'-করা কাগজ। জয়ন্ত মুখ নামিয়ে পাঠ করলে ঃ

"সধবাকে আমি বিধবা ভেবে বিবাহ করেছি---মাধবীর শাস্ত্রসম্মত স্বামী আবার ফিরে আসছে। এর পর সমাজে আমার আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। এই লজ্জা ও অপমানের কবল থেকে নিস্তার পাবার জন্যে আজ আমি এই পত্র লিখেই আত্মহত্যা করব এবং এর জন্যে আর কেহ দায়ী হবে না। ইতি---

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী"

জয়ন্ত টাইপরাইটার যন্ত্রটা ধ'রে নাড়াচাড়া ক'রে মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবতে লাগল। তারপর পকেট থেকে রূপোর শামুকের মত দেখতে নস্যদানটা বার ক'রে একটিপ নস্য গ্রহণ করলে।

গোড়া থেকেই মাণিক এই অভাবিত আত্মহত্যার ব্যাপারটা স্বাভাবিক ব'লে গ্রহণ করতে পারে নি। উড়োচিঠির সত্যতা সম্বন্ধে কালীবাবুর নিজেরই সন্দেহ ছিল এবং সেইজন্যেই তিনি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সন্দেহ নিরসন না ক'রেই তিনি যে আত্মহত্যা করবেন, তাঁর প্রকৃতি এতটা দুর্বল ছিল না। বিশেষ কালীবাবু ছিলেন যেন জীবনজোয়ারের মূর্তিমান উচ্ছ্বাস; নিখিল বিশ্বের পরিপূর্ণ আনন্দ আশ মিটিয়ে উপভোগ করবার জন্যে তাঁর চিত্তে ছিল একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা; এত

সহজে দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়ে আত্মহত্যা করবার মানুষ তিনি ছিলেন না। তার বিশ্বাস, জয়ন্তও এই কথা জানে এবং মানে।

জয়ন্ত হঠাৎ এখন নস্য নিলে কেন? বহু মামলায় মাণিক বারংবার লক্ষ্য করেছে, স্বপক্ষে কোন মূল্যবান সূত্র পেলেই জয়ন্ত খুসি হয়ে নস্য না নিয়ে পারে না। ঐ টাইপরাইটারটা নেড়েচেড়ে সে এমন কি আনন্দজনক সূত্র আবিষ্কার করলে? কিন্তু জয়ন্তের মুখ দেখে এ প্রশ্নের কোন উত্তরই পাওয়া যায় না। তার মুখ একেবারেই কালীঘাটের পটে-আঁকা মূর্তির মত ভাবহীন।

মুরুব্বির মত মস্তক সঞ্চালন করতে করতে ভূপেনবাবু বললেন, "কি জয়ন্তবাবু, এখন কি ভাবছেন? যা বললুম, তাই তো? কালীবাবু নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করেছেন—এটা হচ্ছে নিতান্ত হালকা মামলা।"

রূপোর নস্যদানটা পকেটস্থ ক'রে জয়ন্ত বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক। এটা নিতান্ত হালকা মামলা।"

ভূপেনবাবু বললেন, "তাহলে এই রক্তাক্ত দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা খামোকা আর মেজাজ খারাপ করি কেন? বাইরে চলুন।"

—"তাই চলুন। বাইরে গিয়ে মতিবাবুর কাছ থেকে আমি দু-একটা কথা জানবার চেষ্টা ক'রব। আশা করি ওঁর আপত্তি হবে না?"

মতিলাল দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললে, "বিলক্ষণ! আপত্তি আবার কিসের? তবে আমাকে বেশীক্ষণ ধ'রে না রাখলেই বাধিত হব, কারণ এই দুর্ঘটনার ফলে আমার ঘাড়ে পড়েছে অনেক অপ্রীতিকর কাজের ভার।"

ছয়

—"মতিবাবু, আপনি কালীবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করছেন কতদিন ?"

"—তিন বৎসর।"

"কালীবাবু নিজের সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতেন ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার উপরে ছিল তাঁর অটল বিশ্বাস। কেবল সাংসারিক নয়, সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপার নিয়েই আমার সঙ্গে তিনি পরামর্শ করতেন।"

—"কালীবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র তারাপ্রসন্নবাবুকে আপনি চেনেন কি ?"

"—নিশ্চয়ই চিনি! এই কালকেই তো তিনি এখানে এসে বিষম হুলস্থুল বাধিয়ে দিয়েছিলেন।"

—"সে আবার কি ?"

—"কালীবাবুর সঙ্গে তাঁর ভয়ানক ঝগড়া হয়েছিল। আমি সেখানে হাজির না থাকলে খুড়োকে তিনি নিশ্চয় মেরেই বসতেন।"

—"কেন ?"

—"কালীবাবুর অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তি পাবার কথা তারাপ্রসন্ন বাবুরই। কিন্তু কালীবাবু সম্প্রতি উইল করে সমস্ত সম্পত্তি দিয়েছেন তাঁর সহধর্মিণী মাধবী দেবীকে।"

—"সমস্ত সম্পত্তি ?"

"—এক রকম তাই বটে। তারাপ্রসন্নবাবু পাবেন কিছু-কিছু মাসোহারা মাত্র। অবশ্য মাধবী দেবী ভোগ করবেন কেবল জীবনস্বত্ব—তাঁর অবর্তমানে তারাপ্রসন্নবাবুরই বংশধরগণ সম্পত্তির

মালিক হ'তে পারবেন। কিন্তু উইলের এই শর্ত তারাপ্রসন্নবাবুর মনঃপূত হয়নি, আর তাই নিয়েই ঝগড়া।"

—"উইল কবে হয়েছিল?"

—"গেল হপ্তায়, অর্থাৎ আজ থেকে ছয়দিন আগে।"

এই সময়ে বাড়ীর ভেতর থেকে একজন দাসী মতিলালের সামনে এসে বললে, "মা-ঠাকরুন আপনাকে ডাকছেন।"

মতিলাল বললে, "শুনলেন তো, আমার তলব পড়েছে? কর্তা-গিন্নী দুজনেরই আমাকে না হ'লে চলে না। বেশী বিশ্বস্ত হওয়ার মানেই হচ্ছে, বেশী খাটুনি খেটে মরা।"

—"মা-ঠাকরুন কে?"

—"মাধবী দেবী।"

—"বেশ, আপনি আসুন, আমার আর কিছু জানবার নেই।··· না, না, আমার আর একটি মাত্র জিজ্ঞাস্য আছে। কালীবাবুর বাড়ীতে বাংলা টাইপরাইটার আছে কয়টি?"

—"একটা।"

—"ব্যস্, আমার কথা ফুরুলো।"

মতিলালের হন্তদন্তের মত প্রস্থান।

ভূপেনবাবু বললেন, "জয়ন্তবাবু, বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মিছে আর ফ্যাঁকড়া বাড়াচ্ছেন কেন? নিজের হাতে যে মরে, তাকে আর কোন সাহায্যই করা যায় না।"

জয়ন্ত রসহীন কণ্ঠে হাস্য ক'রে বললে, "আপনি যথার্থ কথাই বলেছেন। এটা নিতান্তই একটা হাল্‌কা মামলা। তবে আমার একটি অনুরোধ রাখবেন?"

—"বলুন।"

"আত্মহত্যার আগে কালীবাবু যে কথাগুলি 'টাইপ' করে

গিয়েছিলেন, ঐ টাইপরাইটারেই সে কথাগুলি আর একখানা কাগজে 'টাইপ' করিয়ে আমাকে একবার দেখাতে পারেন?"

—"এ আবার আপনার কি খেয়াল?"

—"যথাসময়েই সব কথা বলব। বৈকালে আপনার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে।"

সাত

বৈকাল। জয়ন্ত ও মাণিক থানার ভিতরে প্রবেশ করল।

তাদের দেখেই ভূপেনবাবু টেবিল চাপড়ে বলে উঠলেন, "আরে জয়ন্তবাবু, আপনি এ আবার কি গোল বাধালেন?"

মুখ টিপে হেসে জয়ন্ত বললে, "ব্যাপার কি?"

—"বড়ই রহস্যময়। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

—"কি বুঝতে পারছেন না?"

—"যে টাইপরাইটারের সঙ্গে কালীবাবুর অন্তিম স্বীকার-উক্তি সংলগ্ন ছিল, তার মধ্যে 'রিবন' বা কালির ফিতে নেই।"

—"আমি তা জানি।"

—"কেবল তাই নয়। তারপর নতুন রিবন আনিয়ে কালীবাবুর সেই স্বীকার-উক্তির 'কপি' করে দেখা গেল, সেটা 'টাইপ' করা হয়েছে অন্য কোন 'মেসিনে,' কারণ আসল আর নকলের 'টাইপ-এর ছাঁদ একরকম নয়।"

—"ব্যাপারটা যে এই রকম দাঁড়াবে, আমি আগেই সেটা অনুমান করতে পেরেছিলুম। এটা নিতান্ত হাল্কা মামলা।"

ভূপেন প্রায় গর্জন ক'রে বলে উঠলেন, "কে বলে মামলাটা হাল্কা? মামলাটা এর মধ্যেই দস্তুরমত ভারী হয়ে উঠেছে!"

জয়ন্ত বেশ সহজভাবেই বললে, 'হাল্কা কি ভারী জানি না মশাই, তবে এটা যে খুনের মামলা, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।"

ভূপেনবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন, "আপনি যে আরো বেশী ভারী—অর্থাৎ গুরুতর কথা বলছেন! আত্মহত্যাকেও আপনি খুন বলে চালাতে চান নাকি?"

—"ভূপেনবাবু, আমার মত আপনিও তো স্বকর্ণে শুনেছেন কালী-বাবুর একটার বেশী টাইপরাইটার ছিল না? আর স্বচক্ষেই তো দেখেছেন, তাইতেই আটকানো ছিল তাঁর স্বীকার-উক্তি? অথচ সেই টাইপরাইটারে কালির ফিতে ছিল না! আপনি নিশ্চয়ই বলবেন না যে, আত্মহত্যার পূর্ব-মুহূর্তে নিজস্ব টাইপরাইটার থাকতেও কালীবাবু বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও ছুটে গিয়ে অন্য যন্ত্রে তাঁর স্বীকার-উক্তি 'টাইপ' ক'রে এনেছিলেন? এটা একেবারেই অসম্ভব। এর মধ্যে নিশ্চয়ই দ্বিতীয় ব্যক্তির হাত আছে।"

—"দ্বিতীয় ব্যক্তি?"

—"হ্যাঁ, হত্যাকারী।"

ভূপেনবাবুর লম্ফত্যাগ ও আসনত্যাগ। সে চমকিত কণ্ঠে বললে, "কি বলছেন আপনি!"

জয়ন্ত নিজের মনেই বললে, "ঘরের মেঝে থেকে কালীবাবুর আঙুলের ব্যাণ্ডেজ তুলে নিয়ে প্রথমেই আমার চোখ খুলে যায়। কালীবাবুর ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনী ছিল ঐ ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বাঁধা। সে অবস্থায় কেউ রিভলভারের ঘোড়া টিপতে পারে না। অবশ্য কালী-বাবু নিজেই পটি খুলে ঘোড়া টিপতে পারতেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে পটির উপরে এক ফোঁটা রক্তের দাগও লাগত না এবং তিনি তা করেনও নি।

তিনি যখন গুলীবিদ্ধ হন, তাঁর আঙুলের উপরে তখন পটি বাঁধা ছিল, আর সেই জন্যেই পটির উপরে ছিল রক্তের ছোপ। সুতরাং হত্যাকাণ্ডের পর পুলিসের চোখে ধূলো দেবার জন্যে হত্যাকারীই যে পটিটা সরিয়ে ফেলেছিল, এতে আর কোনই সন্দেহ নেই।"

নির্বাক ভূপেনবাবু মুখব্যাদান ক'রে জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন পরম বিস্ময়ে।

জয়ন্ত বললে, "এই মামলায় দুটো সবচেয়ে প্রমাণ হচ্ছে রক্তাক্ত পটি আর 'রিবন'-হীন টাইপরাইটার। এই দুটো প্রমাণেই জানা যায়, ঘটনাস্থলে আর্বিভূত হয়েছিল দ্বিতীয় ব্যক্তি। তাড়াতাড়িতে সে লক্ষ্য করতে পারে নি যে, পটির উপরে রক্তের ছোপ আছে। অন্য কোন টাইপরাইটারে আগে থাকতেই সে স্বীকার-উক্তি 'টাইপ' ক'রে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল,কালীবাবুর মেসিনে সেখানাআটকাবার সময়ে কল্পনাও করতে পারে নি যে, তার মধ্যে নেই কালির ফিতে।"

ভূপেনবাবু চমৎকৃত, তখনও তাঁর মুখে রা নেই।

জয়ন্ত বললে, "এখন প্রশ্ন ওঠে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি কে হ'তে পারে? ভূপেনবাবু, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রে দেখেছেন, যে পত্রখানা কালীবাবুর তথাকথিত আত্মহত্যার হেতু, তার 'ট্রেডমার্ক' ? খোঁজ নিলে জানতে পারবেন, কালীবাবু নিজেও ঐ একই 'ট্রেডমার্ক' মারা কাগজ ব্যবহার করেন। এই দেখে সন্দেহ হয়, পত্রপ্রেরক তাঁর বাড়ীতে আনাগোনা করবার সুযোগ পায়। কিন্তু এ সন্দেহের বিশেষ মূল্য নেই, কারণ এরকম কাগজ বাজারে সুলভ, সুতরাং পরস্পরের সঙ্গে অপরিচিত যে-কোন ব্যক্তি ব্যবহার করতে পারে। অতএব অন্য উপায়ে আমাদের হত্যাকারীর সন্ধান করতে হবে। ভূপেনবাবু, আপনি আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন কি ?"

ভূপেনবাবু ক্ষীণস্বরে শুধোলেন, "কি ?"

—"ইজি-চেয়ার আর তার উপরকার মৃতদেহের অবস্থান ?"

—"হ্যাঁ। চেয়ার আর দেহ দুইই ছিল ঘরে ঢোকবার দরজার মুখোমুখি।"

—"ঘরে দরজা ছিল একটিমাত্র। তাহ'লে ?"

—"কেউ যদি ঘরে ঢুকে থাকে, তবে তাকে কালীবাবুর সুমুখ দিয়েই ঢুকতে হয়েছিল।"

—"কেউ যদি কেন ভূপেনবাবু, কেউ নিশ্চয়ই ঘরে ঢুকেছিল।"

—"আপনি কি বলতে চান, খুনী যখন ঘরে ঢোকে, কালীবাবু তাকে দেখতে পেয়েছিলেন ?"

—"তাইতো বলতে চাই।"

—"অথচ কালীবাবু তাকে বাধা দেন নি ?"

—"না, কারণ সে ছিল তাঁর পরিচিত। হ্যাঁ, অতি পরিচিত, তাই সন্দেহের অতীত। কারণ খুনী যে ঘরে ঢুকেই সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গুলী ছোঁড়ে নি, সে প্রমাণও আছে। কালীবাবুর ডান রগের উপরে রিভলভারের নলচে লাগিয়ে গুলী ছোঁড়া হয়েছিল, আমরা সকলেই তা জানি। সুতরাং বুঝতে হবে যে, খুনী যখন ঘরে ঢুকে কালীবাবুর খুব কাছে ডান পাশে এসে দাঁড়ায়, তখনও তিনি তাকে কিছুমাত্র সন্দেহ করতে পারেন নি, কেন-না সে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। এখন আন্দাজ করতে পারেন, কে এই ব্যক্তি ?"

ভূপেনবাবু কতকটা অভিভূতের মত হয়ে পড়েছিলেন, এতক্ষণ পরে তাঁর দেহে, মুখে ও চোখে জাগ্রত হ'ল জীবনচাঞ্চল্য। উত্তেজিতভাবে ব'লে উঠলেন, "আলবৎ আন্দাজ করতে পারি, নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারি।"

—"কে সে ?"

—"কালীবাবুর ভাইপো তারাপ্রসন্ন। আমি এখনি তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ব।"

জয়ন্ত স্মিতমুখে বললে, "হ্যাঁ, সম্পত্তি থেকে প্রায় বঞ্চিত হয়ে কালীবাবুর উপরে সে বিষম খাপ্পা হয়ে আছে বটে। এমন অবস্থায় অনেক খুনখারাপি হতে দেখা গিয়েছে। আপনার অনুমান অসঙ্গত নয়।"

—"তাহ'লে এখানে দাঁড়িয়ে আমি আর সময় নষ্ট করি কেন? বিলম্বে কার্যহানির সম্ভাবনা।"

—"তিষ্ঠ ক্ষণকাল। আর একটু সবুর করলে ক্ষতি হবে না। আমার হাতে আরো কিছু কিছু প্রমাণ আছে।"

আট

ভূপেনবাবু বললেন, "যা বলবার বলে ফেলুন মশাই, আমার আর তর সইছে না।

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ, তারাপ্রসন্নের উপরে সন্দেহ হবারই কথা। ও-বাড়ীতে তার আনাগোনা ছিল। সে জুয়াড়ী, মগুপ, লম্পট, বেকার—তার মত লোক সম্পত্তি হারিয়ে যে চণ্ডালে-রাগের বশবর্তী হয়ে নরহত্যা করবে, এটা কিছু অসম্ভব নয়।"

ভূপেনবাবু বললেন, "হায় হায়, গোড়া থেকেই তার উপরে আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল, তাহ'লে এতক্ষণ তার হাতে আমি লোহার বালা পরিয়ে দিতে পারতুম!"

—"এইবারে আর একটা কথা ভেবে দেখুন ভূপেনবাবু। ঘটনার রাত্রের কথা স্মরণ করুন। ঘড়িতে এগারোটা বেজেছে।

দরজার দিকে মুখ ক'রে কালীবাবু ইজি-চেয়ারের উপরে ব'সে আছেন। এমন সময়ে যে তারাপ্রসন্ন খানিক আগে মারমুখো হয়ে তাঁর সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া ক'রে গেছে, সে হঠাৎ ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল। আপনি যদি কালীবাবু হতেন, এ অবস্থায় পড়লে কি করতেন ?"

—"উঠে তারাপ্রসন্নকে তেড়ে মারতে যেতুম, নয়তো দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতুম, নয়তো—"

—"থাক, ওতেই চলবে। কিন্তু কালীবাবু ও-সব কিছুই করেন নি। তিনি নিশ্চিন্তভাবে চেয়ারের উপরেই বসে রইলেন, আর তারাপ্রসন্ন নির্বিবাদে সুমুখ দিয়ে সোজা তাঁর ডান পাশে এসে তাঁকে গুলী করে সরে পড়ল! এটা কি সম্ভবপর ?"

—"উঁ-হু!"

—"তাহ'লে বেশ বোঝা যাচ্ছে তারাপ্রসন্ন হত্যাকারী নয়!"

ভূপেনবাবু দস্তুরমত মুষড়ে প'ড়ে বললেন, "আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই! এই টেনে তোলেন আকাশে, এই ঠেলে ফেলেন পাতালে।"

জয়ন্ত অবিচলিত ভাবে বললে, "আপনি মহীতোষ সেনের কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন ?"

—"ভুলিনি, কারুকেই ভুলিনি। কিন্তু তার সঙ্গে এই খুনের কি সম্পর্ক ?"

—"চিঠিতে সে নিজের ঠিকানা আর হাতের লেখা গোপন করেছে। কালীবাবু তাকে নিশ্চয়ই চিনতেন।"

"—ও-রকম গোপনতার মানে হয় না। কালীবাবু বেঁচে থাকলে সে যে নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত, এটাও ভুলবেন না যেন।"

—হ্যাঁ, পরে সত্যই দেখা করতে সে এসেছিল হত্যার সংকল্প নিয়ে। কিন্তু সে চিঠিখানা লিখেছিল অন্য উদ্দেশ্যে।"

—"কি উদ্দেশ্যে ?"

"—ঐ চিঠির সঙ্গে কালীবাবুর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হ'লে সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস হবে, কালীবাবু আত্মহত্যা করেছেন। দৈবগতিকে তদন্তে কেউ আসল ব্যাপার সন্দেহ করলেও, সে থাকবে নিরাপদে। কারণ, পত্রে তার হাতের লেখা বা ঠিকানা নেই।"

ভূপেনবাবু হতাশভাবে বললেন, "এ যে বিশ বাঁও জলের নীচে পড়লুম রে বাবা! যাকে জানি না, চিনি না, তাকে ধরব কেমন ক'রে ?"

ভূপেনবাবুর হাতে একটা ফটো গুঁজে দিয়ে জয়ন্ত বললে, "বন্ধুদের সঙ্গে সদলবলে এই দেখুন মহীতোষকে। ডান দিক থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তিই হচ্ছে আপনার আসামী। চিনতে পারেন ?"

ছবির উপরে চোখ বুলিয়ে ভূপেনবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, "মোটেই না।"

জয়ন্ত আর একখানা ছবি দেখিয়ে বললে, "এর মধ্যে মহীতোষের মূর্তি 'এনলার্জ' ক'রে দেখানো হয়েছে। ছোট ছবিতে ওর মুখের খুঁটিনাটি ভালো ক'রে বোঝা যাচ্ছিল না। মহীতোষের দাড়ি-গোঁফ কামানো ছিল, কেবল আমি শখ ক'রে তার নাকের তলায় ছোট্ট একজোড়া গোঁফ এঁকে দিয়েছি। এখন বলুন তো মশাই, ঐ গোঁফ, ঐ জোড়া-ভুরু আর ডান গালের ঐ আঁচিল আপনি এর আগে আর কোন মুখে দেখেছেন কিনা ?"

ভূপেনবাবু দুই চক্ষু ছানাবড়ার মত ক'রে তুলে বললেন, "আরে এ যে মতিলাল মজুমদার, কালীবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারি !"

—"তাহ'লে এবারে চিনতে পেরেছেন ? উত্তম ! হ্যাঁ, মতিলালই হচ্ছে খুনী এবং মহীতোষ সেন। নাম ভাঁড়িয়ে সে কালীবাবুর

কাছে চাকরি নিয়েছিল। কালীবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে এই ব্যাপারে তার যোগসাজস থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে। তবে মাধবী দেবী যে তাঁর পূর্ব-স্বামীকে চিনতে পেরেছিলেন, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কালীবাবুকে ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হ'ত অনেক দিন পূর্বেই, কিন্তু মাত্র ছয়দিন আগে উইলে মাধবীকে জীবন-স্বত্ব দিয়ে তিনি নিজের মৃত্যুকে ঘনিয়ে এনেছিলেন নিজেই। এখন আপনার কর্তব্য আপনি করুন ভূপেনবাবু, আপাততঃ বিদায় মাগে সখের গোয়েন্দারা।'

জয়ন্তের দুই হাত চেপে ধ'রে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ভূপেনবাবু বললেন, "স্বীকার করি, আপনি হচ্ছেন অতুলনীয়।"

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে, "কিছু না, কিছু না। সত্যই এটা নিতান্ত হাল্‌কা মামলা, নইলে এত সহজে কিনারা হ'ত না। তবে ব্যাণ্ডেজ আর টাইপরাইটার নিয়ে ভ্রম না করলে মতিলালকে মহীতোষ বলে চিনতে পারলেও কেউ তার কিছুই করতে পারত না। সে ধরা পড়ল খালি সামান্য অসাবধানতার জন্যেই। চলে এস মাণিক, এখন ভূপেনবাবু যাবেন মহীতোষের খোঁজে।"

পলাতক চায়ের পেয়ালা

একটা তদন্ত সেরে মাণিকের সঙ্গে বাড়ী ফিরছিল জয়ন্ত। হঠাৎ রাস্তার ধারের একখানা বাড়ির একতালার জান্‌লা থেকে আত্মপ্রকাশ করলে ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টার সুন্দরবাবুর সুপরিচিত মুখখানি ও তাঁর দোদুল্যমান ভুঁড়ি।

—"হুম্! বলি ও জয়ন্ত! একবার এদিকে পদচালনা করবে কি? কিঞ্চিৎ সমস্যায় পড়ে গিয়েছি ভায়া! বাড়ির ভিতরে এস।"

একতালার যে ঘরের ভেতরে তারা প্রবেশ করলে, বোধ হয় সেটা বৈঠকখানা। একটা গোল-টেবিলের উপরে রয়েছে চায়ের পেয়ালা এবং 'টোস্ট্' ও 'এগ-পোচ্' প্রভৃতির পাত্র।

জয়ন্ত বললে, "ব্যাপার কি? এখানে বসে এত বেলায় প্রাতরাশ সারছেন যে?"

সুন্দরবাবু বললেন, "এতক্ষণ ফুরসত হয়নি ভায়া! কিন্তু তোমরা জানোই তো, চা-টা না খেলে আমার বুদ্ধি খোলে না, তাই পাড়ার একটা দোকান থেকে কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য আর পানীয় আনাতে বাধ্য হয়েছি। তোমাদের জন্যে আনাব নাকি?"

—"নিশ্চয়ই নয়। একদিনে দু'-বার প্রাতরাশ আমাদের ধাতে সহ্য হয় না।"

—"তাহ'লে তোমরা ব'সে ব'সে শোনো আর আমি খেতে খেতে বলি।"

জয়ন্ত ও মাণিক আসন গ্রহণ করলে পর সুন্দরবাবু বললেন, "গৌরচন্দ্রিকা না ক'রে খুব সংক্ষেপেই ব্যাপারটা বলি শোনো। এসেছি এখানে একটা চুরির মামলায়, কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে পিছনে অন্য কোন রহস্যও থাকতে পারে। এই বাড়িখানার মালিক হচ্ছেন পরিতোষ রায়চৌধুরী। হরিপুরের জমিদার। বেশীর ভাগ সময় মফস্বলেই থাকেন, কাজের তাগিদে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন। এবারে একখানা বাগান কেনবার জন্যে তাঁর কলকাতায় আবির্ভাব হয়েছিল। বাগানখানা আজই কেনবার কথা, তাই কাল তিনি ব্যাঙ্ক থেকে দশ হাজার টাকার নোট আনিয়ে নিজের শোবার ঘরের আলমারির ভেতর রেখে দিয়েছিলেন। সেই টাকা চুরি গিয়েছে!"

—"কেমন ক'রে ?"

—"তা কেউ জানে না।"

—"পরিতোষবাবু কি বলেন ?"

—"তাঁর কিছুই বলবার শক্তি নেই। কারণ কাল রাত্রেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।"

—"স্বাভাবিক মৃত্যু ?"

—"হুম্, আমারও মনে জেগেছে এই জিজ্ঞাসা। কিন্তু লাশের কোথাও সন্দেহজনক কোন চিহ্নই নেই। পরিতোষবাবুর পারিবারিক চিকিৎসক হচ্ছেন বিখ্যাত ডাক্তার এস. এন. সিংহ। তাঁর মতে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার দরুণ পরিতোষবাবুর মৃত্যু হয়েছে। তিনি কিছুকাল থেকেই বুকের অসুখে ভুগছিলেন, কাল সন্ধ্যাতেও তিনি নাকি বুকের ভিতরে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন।"

—"এ কথা কে আপনাকে বললে ?"

—"মুরারিবাবু।"

—"তিনি কে ?"

—"পরিতোষবাবুর প্রতিবেশী। তিনিও আগে ডাক্তারি করতেন, এখন ও-ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন। রাস্তার ওপারেই সামনের ঐ বাড়িখানায় তিনি থাকেন। সর্বশেষে তিনিই কাল জীবিত অবস্থায় পরিতোষবাবুকে দেখে গিয়েছেন।"

—"মৃতদেহের সৎকার হয়েছে ?"

—"না। পরিতোষবাবু এবারে একলাই কলিকাতায় এসেছেন। হরিপুরে তাঁর পরিবারবর্গের কাছে খবর পাঠানো হয়েছে, তাঁরা এখনো এসে পৌঁছন নি।"

—আপনি সমস্যায় পড়েছেন বলছেন, কিন্তু আপনার সমস্যাটা কি ?"

—"একই রাত্রে পরিতোষবাবুর মৃত্যু আর টাকা চুরি কি সন্দেহ-জনক নয়? অথচ মৃত্যুর জন্যে সন্দেহ প্রকাশ করবার উপায় নেই, কারণ এস. এন. সিংহের মত বিখ্যাত ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তা না হ'লে লাশ আমি মর্গে পাঠাতে বাধ্য হতুম।"

—"আচ্ছা, চুরির কথাই হোক। আলমারিতে দশ হাজার টাকার নোট আছে, এ খবর আর কেউ জানত?"

—"সন্তোষবাবু জানতেন। তিনি পরিতোষবাবুর ম্যানেজার, এই বাড়িতেই থাকেন। টাকাটা তিনিই ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনেছিলেন।"

—"মুরারিবাবু কি বলেন?"

—"টাকার কথা তিনি নাকি কিছুই জানতেন না।"

—"এ বাড়িতে আর কে থাকে?"

—"দুজন দ্বারবান, দুজন বেয়ারা, একজন পাচক।"

—"রাত্রে পরিতোষবাবুর শয়নগৃহের দরজা কি ভেতর থেকে বন্ধ ছিল?"

—"না।"

—"মৃতদেহটা আমি একবার দেখতে পারি কি?"

—"অনায়াসে। চল।"

দুই

মাঝারি আকারের ঘর। একদিকে একটা আলমারি—টাকা ছিল তার ভিতরেই। একদিকে একখানা পালঙ্ক। রাস্তার ধারের জান্‌লার সামনে একটি ছোট টেবিল ও একখানা চেয়ার। মেঝেতে কার্পেটের উপরে পাতা একটি ছোট বিছানা, মৃতদেহ ছিল তার উপরেই।

পরিতোষবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দোহারা চেহারা। পরনে কেবল গেঞ্জী ও কাপড়। মুখ দেখলে মনে হয়, তিনি যেন ঘুমোচ্ছেন!

জয়ন্ত বেশ খানিকক্ষণ ধ'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মৃতদেহটা পরীক্ষা করল। তারপর পকেট থেকে একখানা আতশী কাচ বার ক'রে মৃতদেহের বাম হাতের বুড়ো আঙুলের উপরে রেখে কি দেখতে লাগল। তারপর ফিরে বলল, "সুন্দরবাবু, এই ক্ষতচিহ্নটা আপনি কি দেখেছেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "ক্ষতচিহ্ন?"

—"হ্যাঁ। অত্যন্ত ছোট একটা ক্ষত, প্রায় অকিঞ্চিৎকর বললেই চলে, বিশেষ ভাবে না দেখলে চোখেই পড়ে না।"

ভালো ক'রে দেখে সুন্দরবাবু বললেন, "ধেৎ, এ একটা তুচ্ছ ব্যাপার, এ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।"

জয়ন্ত বললে, "পরিতোষবাবুর ম্যানেজার সন্তোষবাবু আর তাঁর প্রতিবেশী মুরারিবাবুকে আমি দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

তাঁরা দুজনেই ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়ালেন। দুজনেরই অত্যন্ত সাধারণ চেহারা, বর্ণনা করবার মত কিছুই নেই।

জয়ন্ত সুধোলে, "সন্তোষবাবু, পরিতোষবাবুর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা কেটে গিয়েছিল কেমন ক'রে?"

সন্তোষবাবু বললেন, "কাল সকালে পেনসিল বাড়াতে গিয়ে কর্তার হাত সামান্য একটু ছ'ড়ে যায়। মাত্র দু-এক ফোঁটা রক্ত পড়েছিল, কর্তা তা আমলেই আনেন নি।"

মুরারিবাবু বললেন, "এ বিষয়ে আমি আরো দু' একটা কথা বলতে পারি। কাল সন্ধ্যাবেলায় আমার সঙ্গে দাবা খেলতে খেলতে পরিতোষবাবু বললেন, 'বুড়ো আঙুলটা একটু টনটন্ করছে।'

আমিও আগে ডাক্তারি করতুম। কোন ক্ষতকেই অবহেলা করা উচিত নয় ব'লে আমি নিজের বাড়িতে গিয়ে 'লাইজলের' শিশিটা নিয়ে আসি। তারপর খেলা শেষ হয়ে গেলে পর একটা চায়ের পেয়ালায় জল ভ'রে তাতে দশ ফোঁটা 'লাইজল' ঢেলে পরিতোষবাবুকে বলি সেই জলে মাঝে মাঝে কাটা আঙুলটা ভিজিয়ে রাখতে। ঠিক সেই সময়েই পরিতোষবাবু বুকের কাছে ব্যথা বোধ করেন। আমি তাঁকে শুয়ে পড়তে ব'লে বাড়ি ফিরে যাই।"

জয়ন্ত বললে, "তাহ'লে কাল আপনি এ বাড়িতে দুবার এসে-ছিলেন ?"

—"না, তিনবার।"

—"তিনবার ?"

—"হ্যাঁ, আমি একটু রাতে আর একবার এসেছিলুম, সন্তোষবাবু সে কথা জানেন।"

—"আবার এসেছিলেন কেন ?"

—"পরিতোষবাবুর বুকের ব্যথাটা কেমন আছে জানবার জন্যে। কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখলুম, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। কাজেই তাঁকে না জাগিয়েই আবার আমি ফিরে যাই।"

কথা শুনতে শুনতে জয়ন্ত ঘরের চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করছিল। সে বললে, "মুরারিবাবু, আপনি যখন তৃতীয়বার এ ঘরে আসেন, সেই 'লাইজল'-এর পেয়ালাটা কোথায় ছিল ?"

—"ঐ টেবিলটার উপরে।"

—"কিন্তু সেটা এখন আর ঘরের কোথাও দেখতে পাচ্ছি না কেন ?"

মুরারীবাবু হতভম্বের মত বললেন, "আমি কেমন করে বলব ?"

—"সন্তোষবাবু কি পেয়ালাটাকে সরিয়ে রেখেছেন ?"

সন্তোষবাবু দৃঢ়স্বরে মাথা নেড়ে বললেন, "নিশ্চয়ই নয়।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! পেয়ালাটা কি তাহ'লে জ্যান্ত হয়ে ঘরের ভেতর থেকে স'রে পড়ল?"

জয়ন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "সুন্দরবাবু, বাড়ির ভেতরে খুঁজে দেখুন পেয়ালাটা কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা! সেইই হচ্ছে যত নষ্টের মূল! ততক্ষণে আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে একটু বেড়িয়ে আসতে চাই।" —ব'লেই সে হন্ হন্ ক'রে বেরিয়ে গেল।

তিন

খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে জয়ন্ত আবার একতলার বৈঠকখানায় ঢুকে একজন পাহারাওয়ালাকে ডেকে বললে, "সুন্দরবাবু আর মাণিকবাবুকে সেলাম দাও।"

মিনিট-খানেক পরে সুন্দরবাবু এসে বললেন, "জয়ন্ত, বাড়ির কোথাও চায়ের পেয়ালাটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।"

জয়ন্ত মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, "পাবেন না তা আমি জানি। সুন্দরবাবু, এটা খুব সহজ মামলা। অপরাধী বোকা আর অপরাধটাও কাঁচা, যদিও সে খুন আর চুরি দুইই করেছে।"

—"কি বলছ হে?"

—"মৃতদেহে ক্ষতচিহ্ন দেখে আর পেয়ালা অদৃশ্য হয়েছে শুনেই আমার মন আসল সূত্র খুঁজে পেয়েছিল। আমার মনে সন্দেহ জাগল, পেয়ালায় নিশ্চয় 'লাইজল'-এর বদলে এমন কোন মারাত্মক পদার্থ ছিল, যা আর কারুর জানা উচিত নয়। তাই সেটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে, আর সেটা সরাবার সুযোগ পেয়েছিলেন মুরারিবাবুই,

কারণ তিনি বারবার এখানে আনাগোনা করেছিলেন। আসবার সময় দেখেছিলুম, এ পাড়ায় একটি মাত্র ঔষধের দোকান আছে। সেখানে গিয়ে খবর নিয়ে জেনেছি, কাল সন্ধ্যার সময়ে মুরারি সেখান থেকে ছুটো জিনিস কিনেছে—'সিয়ানাইড অফ পটাসিয়াম' আর 'হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিড'। খানিকটা জলের সঙ্গে 'সিয়ানাইড অফ পটাসিয়াম' গুলে নিয়ে একটুখানি 'হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড' মিশিয়ে দিলেই তা পরিণত হবে মারাত্মক 'প্রুসিক অ্যাসিডে'। মনুষ্যদেহের অতি তুচ্ছ আঁচড়ও তার সংস্পর্শে এলে মাত্র এক সেকেণ্ডের মধ্যে মৃত্যু অনিবার্য। মুরারি নিশ্চয় কোন গতিকে (খুব সম্ভব পরিতোষবাবুর মুখেই) জানতে পেরেছিল আলমারির মধ্যে দশ হাজার টাকার নোটের অস্তিত্ব। সুন্দরবাবু, একটা বড় মামলা নিয়ে আমি এখন বড়ই ব্যস্ত, আপাততঃ আমার আর কিছুই করবার নেই, বাকি তদন্তটা আপনিই সেরে ফেলুন। চলে এস মাণিক!"

পরদিন টেলিফোনের ঘন্টি ধ'রে জয়ন্ত শুনতে পেলে, সুন্দরবাবু বিপুল উল্লাসে বলছেন, "হুম্ জয়ন্ত, হুম্! সঠিক তোমার আন্দাজ। মুরারি অপরাধ স্বীকার করেছে। তুমিই ধন্য!"

পৃথিবীর প্রথম গোয়েন্দা-কাহিনী

তোমরা সবাই নিশ্চয় ডিটেকটিভ গল্প শুনতে ভালোবাসো। কেবল তোমরা কেন, পৃথিবীর সব দেশেই এ-শ্রেণীর গল্পের আদর আছে। অনেক লেখক কেবল ডিটেকটিভ-কাহিনী লিখেই অমর হয়েছেন। বাংলাদেশের পুরোনো গল্পে ও রূপকথাতেও গোয়েন্দা-কাহিনীর অল্প-বিস্তর বিশেষত্ব পাওয়া যায়।

আধুনিক ভালো গোয়েন্দার গল্প বলতে কতকগুলো চমকদার ঘটনার সমষ্টি বোঝায় না ; কারণ প্রধানত তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বুদ্ধির খেলা দেখানো। পাশ্চাত্য দেশে আধুনিক গোয়েন্দা-কাহিনীর স্রষ্টা ব'লে আমেরিকান লেখক এড্‌গার অ্যালেন পো'র নাম করা হয়। তিনি মাত্র গুটি তিনেক ছোট ছোট গোয়েন্দার গল্প লিখে গেছেন, কিন্তু প্রত্যেক গল্পটিই অপূর্ব ! সেগুলি কাল্পনিক গল্প হ'লেও সত্যিকার গোয়েন্দারাও তা প'ড়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে, এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে।

একবার আমেরিকায় একটি মেয়ে খুন হয়। তাই নিয়ে চারদিকে মহা সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু অনেক চেষ্টার পরেও পুলিস খুনিকে ধরতে পারলে না। তখন পো সাহেব সেই খুন অবলম্বন ক'রে একটি ছোট গল্প লিখলেন। প্রথমটা সকলেই গল্প হিসাবেই তাকে গ্রহণ করলে। কিন্তু কিছুদিন পরে সত্যিকার খুনের সঙ্গে জড়িত একাধিক ব্যক্তি যে-সব কথা প্রকাশ ক'রে দিলে, তাতে জানা গেল যে, পো-সাহেবের সৃষ্ট কাল্পনিক ডিটেকটিভের সন্দেহ ও অনুমানই সত্য।

ইংরেজ লেখক স্যার আর্থার কন্যান্ ডইলের নাম আজ কে

না জানে? তাঁর লেখা সার্লক্ হোম্‌সের গল্প পৃথিবীর সব দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এডগার অ্যালেন পো যদি গোয়েন্দার গল্প না লিখতেন, তাহলে সার্লক হোম্‌সের নাম আজ কেউ শুনতে পেত কিনা সন্দেহ!

তবে আসলে আধুনিক গোয়েন্দা-কাহিনীর উৎপত্তি হয়েছে আঠারো শতাব্দীতে ফরাসী দেশে। তোমরা এখনও ভল্‌তেয়ারের বই পড়নি বোধ হয়? রুসো নামে আর এক ফরাসী লেখকের সঙ্গে ভল্‌তেয়ারের রচনা ফরাসী-বিপ্লবের মূলে কাজ করেছিল যথেষ্ট। এই ভল্‌তেয়ারের একখানি উপন্যাস আছে, তার নাম "জ্যাড্‌উইগ।" সেই উপন্যাসে দেখা যায়, রাণীর কুকুর ও রাজার ঘোড়া হারিয়ে গেল, কিন্তু জ্যাড্‌উইগ পথের উপরে কেবল তাদের পদচিহ্ন দেখে বলে দিলে, কুকুরটা মদ্দা না মাদী, সেটা কোন্ জাতের, তার বাচ্চা হয়েছে কিনা ও তার ল্যাজ কত বড় এবং ঘোড়ার আকার কত উঁচু, তার পা খোঁড়া কিনা প্রভৃতি আরো অনেক আশ্চর্য কথা।

এই জ্যাড্‌উইগের বুদ্ধি-কৌশলে রাজা কেমন ক'রে সাধু কোষাধ্যক্ষ পেয়েছিলেন, সে গল্পটাও শোনবার মত।

একদিন রাজা দুঃখ ক'রে বললেন, "জ্যাড্‌উইগ, আজ পর্যন্ত আমি কোন সাধু কোষাধ্যক্ষ পেলুম না। যাকে কোষাধ্যক্ষের পদ দিই, সেই-ই দু'হাতে টাকা চুরি করে। তুমি তো এত বুদ্ধিমান, সাধু কোষাধ্যক্ষ পাওয়া যায় কেমন ক'রে, বলতে পারো?"

জ্যাড্‌উইগ বললে, "পারি মহারাজ। যে সব-চেয়ে ভাল নাচতে পারবে, সেই-ই সাধু কোষাধ্যক্ষ।"

রাজা বললেন, "পাগলের মত কি যে বল, ঠিক নেই! ভালো নাচিয়ে হ'লেই সাধু হবে? যা নয় তাই!"

জ্যাড্‌উইগ বললে, "আমার কথা সত্য কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখুন না! আমি যা যা বলি তার ব্যবস্থা ক'রে দিন্।"

—"কি ব্যবস্থা ?"

—"রাজসভার পাশের একখানা ঘরে রাশি রাশি হীরে-চুণী-পান্না রেখে দিন। তারপর যারা আপনার কোষাধ্যক্ষ হবার জন্যে দরখাস্ত করেছে, তাদের একে একে সেই ঘরে ঢুকে সভায় আসতে বলুন। ঘরের বাইরে সেপাই পাহারা দিক, কিন্তু ভেতরে যেন কেউ না থাকে।"

রাজা তখনই জ্যাড্‌উইগের কথামত সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে যারা কোষাধ্যক্ষের পদ চায়, তারা প্রত্যেকেই সেই রত্নগৃহের ভিতর দিয়ে একে একে রাজসভায় এসে দাঁড়াল।

রাজা বললেন, "তোমরা কোষাধ্যক্ষ হ'তে চাও ? বেশ, তাহ'লে নাচ আরম্ভ কর।"

—"সে কি মহারাজ ! নাচতে হবে ?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে নাচবে না তার আবেদনও গ্রাহ্য হবে না। ধর নাচ !"

রাজার সিংহাসনের পিছনে দাঁড়িয়ে জ্যাড্‌উইগ দেখলে, কোষাধ্যক্ষ-পদপ্রার্থীরা হতাশ মুখে নৃত্য শুরু করলে। কিন্তু তারা ভালো ক'রে নাচতেই পারলে না—তাদের দেহ জড়োসড়ো ও আড়ষ্ট, মাথা হেঁট, দুই হাত শরীরের দুই দিকে সংলগ্ন, কারুর নাচেই স্বাধীন গতি নেই। ধুপ ধুপ করে মাটিতে পা ছুঁড়ে, ধেই ধেই ক'রে নেচে কেবল নাচের নামরক্ষা করছে মাত্র।

জ্যাড্‌উইগ ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "পাজী, ছুঁচো, বদমাশের দল !"

কিন্তু একটি লোক চমৎকার নাচছে। তার দেহে সঙ্কোচের কোন লক্ষণই নেই, মাথা উন্নত, হাত-পায়ের লীলা মনোরম।

জ্যাড্‌উইগ বললে, "মহারাজ, এই লোকটি সাধু। একেই আপনার কোষাধ্যক্ষের পদ দিন!"

রাজা বিস্মিত স্বরে বললেন, "কি ক'রে তুমি জানলে যে এই লোকটি সাধু?"

জ্যাড্‌উইগ বললে, "মহারাজ, এই একশোজন লোক আপনার কোষাধ্যক্ষ হ'তে এসেছে। কিন্তু ঐ একজন ছাড়া বাকি সবাই যখন একে একে রত্নগৃহের ভিতর দিয়ে এসেছে, তখন লোভ সামলাতে না পেরে মুঠো মুঠো হীরে-চুনী-পান্না তুলে নিয়ে নিজের পকেটে পুরে ফেলেছে। কাজেই পাছে সেগুলো পকেট থেকে ঠিকরে বেরিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে ওরা ভালো ক'রে নাচতেই পারছে না।"

রাজা দুঃখিতভাবে বললেন, "একশোজনের মধ্যে মোটে একজন সাধু!"

জ্যাড্‌উইগ বললে, "মহারাজ, একজন সাধু একাই একশো।"

বলা বাহুল্য, সেই সাধু ব্যক্তিই কোষাধ্যক্ষের কাজ পেলে। বাকি লোকগুলোর কাছ থেকে চোরাই মাল কেড়ে নেওয়া হ'ল তো বটেই, তার উপরে তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হ'ল।

কিন্তু আঠারো শতাব্দীর য়ুরোপের কথা তো অতি-আধুনিক কথা! ডিটেকটিভ গল্পের সৃষ্টি হয়েছে আরো বহু শতাব্দী আগে। পৃথিবীতে যখন ঐতিহাসিক যুগ সবে আরম্ভ হয়েছে, তখনকারও একটি ডিটেকটিভ গল্প আমরা পেয়েছি! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার আগে পৃথিবীতে আর কোনো গোয়েন্দা-কাহিনী লেখা হয় নি।

এই গল্পের নায়ক বা ডিটেকটিভ হচ্ছেন দানিয়েল, বাইবেলে যিনি জ্ঞানী ব্যক্তি ব'লে বিখ্যাত। ঘটনাক্ষেত্র হচ্ছে ব্যাবিলন।

প্রাচীন ব্যাবিলনে এক মস্ত দেবতা ছিলেন, তাঁর নাম বেল্। তাঁকে 'মহা-পর্বত' বলেও ডাকা হ'ত।

হিন্দুদের দেব-দেবীরা এক হিসাবে রীতিমত নির্লোভ। তাঁদের সামনে যত ভালো খাবারই ভোগ ব'লে ধরে দাও, তাঁরা নির্নিমেষ নেত্রে কেবল সেইদিকে তাকিয়ে থেকেই খুশি হন, পরে খাবারগুলো অদৃশ্য হয় প্রকাশ্যভাবেই ভক্তদের ক্ষুধার্ত উদর-গহ্বরে। কে জানে মা-কালীর যদি মাংস খাবার শক্তি থাকত, তাহ'লে কালীঘাটে এত-বেশী পাঁঠা বলি দেওয়া হ'ত কিনা!

কিন্তু ব্যাবিলনের বেল্ ছিলেন দস্তুরমত পেটুক দেবতা। তাঁর সামনে ভোগ দিলে ভক্তদের একটি কণাও প্রসাদ পাবার উপায় ছিল না। অন্তত ব্যাবিলনবাসীরা সেই কথাই মনে করত।

প্রকাণ্ড দেবালয়, তার চূড়ো যেন আকাশ ভেদ করতে চায়। দেবালয়ের সঙ্গেই সংলগ্ন এক প্রাসাদে ঠাকুরের পুরোহিতরা বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাস করে।

ভোগমন্দিরে রাজবাড়ী থেকে রোজ বড় বড় থালায় রাশি রাশি উপাদেয় খাবার আসে, ঠাকুরের পেট ভরাবার জন্যে।

বেল্-ঠাকুর খাইয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু লোকের চোখের সামনে খেতে হয়তো তাঁর লজ্জা হয়। তাই তাঁর সামনে খাবারের থালাগুলো সাজিয়ে রেখে সবাই সরে পড়ে এবং রাত্রে মন্দিরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কিন্তু রোজ সকালে উঠে দেখা যায়—কি আশ্চর্য! পাথরের ঠাকুর বেল্ জ্যান্তো হয়ে সব খাবার খেয়ে হজম করে ফেলেছেন।

দেবতার শক্তি দেখে রাজার মনে ভক্তি-শ্রদ্ধা আর ধরে না; এবং যাদের মন্ত্র-শক্তিতে দেবতা এমন জাগ্রত, সেই পুরোহিত-সম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও লাভের অঙ্ক বেড়ে উঠল রীতিমত।

এমন সময়ে ঘটনাক্ষেত্রে দানিয়েলের প্রবেশ। জাতে তিনি

ছিলেন ইহুদী, ব্যাবিলনে এসেছেন যুদ্ধবন্দী হয়ে। কাজেই বেলের উপরে তাঁর একটুও ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই।

দানিয়েল সমস্ত দেখে-শুনে একদিন বললেন, "মহারাজ, পাথুরে দেবতার পেটের ভিতরটাও নিরেট পাথরে ভর্তি হয়ে আছে, রাশি রাশি মিষ্টান্ন, ফল আর মাংসের লোভে সে পেট ফাঁপা হ'তে পারে না। বেল্ এ-সব খাবার খান না।"

রাজা বললেন, "কি যে বল তার মানে হয় না। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, রাত্রে মন্দিরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ থাকে। মন্দিরের ভিতরে জনপ্রাণী থাকে না, তবু খাবার কোথায় উড়ে যায়?"

দানিয়েল বললেন, "আমার মুখে সে কথা শুনলে আপনি বিশ্বাস করবেন না। আমার কর্তব্য আমাকে করতে দিন, তারপর কাল সকালেই আপনাকে দেখাব, বেল্ খাবার খান না।"

সে-রাত্রেও ষোড়শোপচারে ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হ'ল।

তারপর দানিয়েল এসে প্রথমে মন্দিরের মেঝের উপরে সর্বত্র ভাল ক'রে ছাই ছড়িয়ে দিলেন এবং তারপর মন্দিরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে চ'লে গেলেন।

সকাল হ'ল। রাজাকে সঙ্গে ক'রে দানিয়েল মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দরজা খোলা হ'ল। কিন্তু ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, ঠাকুর চেটেপুটে সব থালার খাবার খেয়ে ফেলেছেন।

রাজার পুরোহিতরা ও সাঙ্গোপাঙ্গোরা দানিয়েলকে লক্ষ্য ক'রে বললে, "কোথাকার এক অবিশ্বাসী ইহুদী এসে আমাদের এত বড় ঠাকুরের শক্তিতে সন্দেহ করে! কী স্পর্ধা!"

রাজা দেবমূর্তির দিকে তাকিয়ে ভক্তিভরে গদগদ স্বরে বললেন, "হে ব্যাবিলনের সনাতন দেবতা, হে মহাপ্রভু বেল্! অসীম তোমার মহিমা, জাগ্রত তোমার উদর!"

দানিয়েল কিন্তু কিছুমাত্র দমলেন না। হাসিমুখে বললেন, "মহারাজ, মন্দিরের মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখুন।"

ছাই-ছড়ানো মেঝের দিকে তাকিয়ে রাজা সবিস্ময়ে বললেন, "একি! এখানে এত ছাই কেন? ছাইয়ের উপরে এত পায়ের দাগ এল কেমন ক'রে? এ যে দেখছি পুরুষের পায়ের দাগ, মেয়ের পায়ের দাগ, শিশুর পায়ের দাগ! এ-সবের মানে কি?"

দানিয়েল বললেন, "মানে খুব স্পষ্ট, মহারাজ! মন্দিরের পিছনে এক গুপ্তদ্বার আছে। পুরুতরা তাদের বউ আর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সেই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে দেবতার ভোগ পেট ভরে খেয়ে পালায়। কিন্তু কাল যে আমি এখানে ছাই ছড়িয়ে রেখেছি, অন্ধকারে সেটা তারা দেখতে পায় নি। তাই পায়ের দাগই তাদের ধরিয়ে দিলে!"

তখন রাজার চোখ ফুটল। বেলের উপরে তাঁর ভক্তি কমল কিনা জানি না, কিন্তু পুরোহিতদের প্রাণদণ্ড হ'ল।

সত্যিকার গোয়েন্দাদের গল্প

পৃথিবীর সব দেশের লেখকরাই তোমাদের জন্যে কত-না গোয়েন্দার কাহিনী রচনা করেছেন! ওঁদের সৃষ্ট এক-একজন গোয়েন্দা কিনেছেন অমর নাম: যেমন কন্যান-ডইলের Sherlock Holmes; এডগার অ্যালেন পো'-র C. August Dupin; জি. কে. চেস্টার্টনের Father Brown; এবং আর. এ. ফ্রিম্যানের Dr. Thorndyke প্রভৃতি। কিন্তু ও-সব গল্প ও তাদের গোয়েন্দাদের জন্ম হচ্ছে কল্পনা-রাজ্যে।

রক্ত-মাংসে গড়া আসল গোয়েন্দারা যে পূর্বোক্ত কাল্পনিক গোয়েন্দাদের চেয়ে কম বাহাদুর নন, আমার "আধুনিক রবিনহুড" পুস্তকে তার দৃষ্টান্ত দিয়েছি। আজও আমাদের অবলম্বন সেই রকম সত্য কাহিনী।

বিলাতের সত্যিকার গোয়েন্দাদের আপিস হচ্ছে লণ্ডনের 'স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড'-এ। ওখানে যারা হাতে-নাতে শিক্ষা পেয়েছে, তাদের সাধারণ কনস্টেবল থেকে উচ্চতম পুলিস-কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই গোয়েন্দার কাজে যার-পর-নাই পাকা।

লণ্ডন শহরের পথে পথে যে-সব কনস্টেবল পাহারা দেয়, তাদের চোখ থাকে সর্বদাই খোলা—তাদের কারুকে কেউ কোনদিন পথের ধারের বাড়ীর রোয়াকে শুয়ে ঘুমোতে দেখেছে, এমন কথা শুনিনি।

এমনি এক সতর্ক কনস্টেবল একদিন দেখলে, একটা বাড়ীর সদর দরজা অসময়ে বন্ধ রয়েছে—কোনদিন যা থাকে না। অমনি সে সন্দিহান হয়ে দরজা ঠেঙাতে লাগল, কিন্তু ভিতর থেকে কারুর সাড়া পেলে না। তখন সে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখলে, বাড়ীর মালিক স্মিদারের মৃতদেহ আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে। তার দেহে কোন রিভলভারের গুলির দাগ নেই। তার ঘরের লোহার সিন্দুক একেবারে খালি।

তখনি পুলিস-তদন্ত শুরু হ'ল। কিন্তু ঘটনাস্থলে খুনী আঙুলের দাগ বা অন্য কোন সূত্র ফেলে রেখে যায় নি ব'লে বোঝা গেল, নিশ্চয়ই সে এ-সব কাজে পাকা পুরাতন পাপী।

কেবল একটি তুচ্ছ জিনিস পাওয়া গেল। শিশুদের খেলবার এক সেকেলে চোরা-লণ্ঠন। প্রমাণিত হ'ল সেটা স্মিদারের লণ্ঠন নয়, তার বাড়ীতে শিশুই ছিল না। অতএব খুনীই সেটাকে এনেছিল রাত্রে জ্বেলে চুপিচুপি কাজ সারবার জন্যে, আর কাজ সেরে পালাবার

সময়ে অবহেলা-ভরে এই শিশুর খেলনা ঘটনাস্থলেই ত্যাগ ক'রে গিয়েছে।

তখন অন্য কোন সূত্রের অভাবে এই খেলনাটি নিয়েই পুলিস কাজ আরম্ভ করলে। খোঁজ নেওয়া হ'তে লাগল এ-রকম সেকেলে খেলনা আধুনিক কোন কারিকর তৈরি করে কি না, এবং কোন দোকানে বিক্রি হয় কি না! কিন্তু কোন সন্ধানই মিলল না।

কিন্তু 'স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড'-এর কর্তারা হতাশ হলেন না। তাঁরা এক কনস্টেবলকে নিযুক্ত করলেন। তার একটি বাচ্চা ছেলে ছিল। সে যখনি রাস্তায় পাহারা দিতে বেরুত, ছেলেকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেত এবং ছেলের হাতে সেই খেলনার লণ্ঠনটি দিয়ে বলত, আমি পাহারা দি, আর তুমি পথে পথে এইটে নিয়ে খেলা ক'রে বেড়াও। বুঝেছ ?"

ছেলের বুঝতে বিলম্ব হ'ল না, কারণ খেলা করা খুব কঠিন কাজ নয়। তবে পিতার এই অসাধারণ উদারতার পিছনে যে কি উদ্দেশ্য ছিল, সেটা বোঝবার মতন বয়স তার তখনো হয় নি।

বাপ পথে পাহারা দেয়, ছেলে পথে লণ্ঠন নিয়ে খেলা ক'রে বেড়ায়। আজ তারা এ-পাড়ায়, কাল অন্য পাড়ায়। এমনি ক'রে দিনের পর দিন যায়!

মাস-কয়েক কাটল। ছেলের এই একঘেয়ে খেলায় আর মন বসে না, কিন্তু বাপের সেই একই হুকুম—'খেলা কর, খেলা কর!' 'স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে'-র সত্যিকার গোয়েন্দাদের অভিধানে 'হতাশা' ব'লে কোন কথা নেই!

কনস্টেবলের ছেলে খেলছে, এমন সময়ে একদিন আর-একটি খোকা তার কাছে এসে দাঁড়াল। ভালো ক'রে লণ্ঠনটি দেখে নাকী সুরে সে কান্না জুড়ে দিলে—"কেন তুই আমার খেলনা নিয়েছিস! দে, আমার লণ্ঠন ফিরিয়ে দে!"

কনস্টেবলের বাচ্চা মাথা নেড়ে বলে, "ইস, তাই বৈকি! এ আমার লণ্ঠন!"

—"না, ওটা আমার!"

—"তোর না, ছাই! আমার!"

কনস্টেবল কান খাড়া ক'রে শুনলে। তারপর এগিয়ে এসে মিষ্টি গলায় বললে, "হ্যাঁ খোকাবাবু, তোমার ভুল হয় নি তো?"

—"না, আমি ঠিক বলছি। এই দেখুন না, লণ্ঠনের পলতে ফুরিয়ে গিয়েছিল ব'লে আমি দিদির ছেঁড়া 'পেটিকোট' কেটে একটা নতুন পলতে বানিয়ে নিয়েছি!"

দেখা গেল, সত্যিই তাই। কনস্টেবল বললে, 'আচ্ছা, আমাকে তোমার বাড়ীতে নিয়ে চল। তাহ'লেই বোঝা যাবে তোমার কথা সত্যি কিনা!'

খোকার মা হচ্ছে বিধবা। গরিব। বাড়ীর এক-একটি ঘর এক-একজনকে ভাড়া দিয়ে সেই টাকায় সংসার চালায়।

খোকার মা বললে, "হ্যাঁ, ও-খেলনাটি আমারই ছেলের। মাস-কয়েক আগে ওটি হারিয়ে যায়।"

—"তখন তোমার বাড়ীতে কে কে ভাড়াটে ছিল?"

খানিকক্ষণ ভেবে-চিন্তে সে বললে, "তখন এখানে দুই বন্ধু থাকত। তাদের একজন হচ্ছে 'প্লাম্বার', আর একজন 'ইলেকট্রিক' মিস্ত্রী। তারা এখন উঠে গেছে।"

পুলিসের পক্ষে সেই দুই বন্ধুকে খুঁজে বার করা কঠিন হ'ল না। বিচারে তাদের ফাঁসি হয়।

'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড'-এর যাদুঘরে আজও সেই খেলনার লণ্ঠনটি যত্ন ক'রে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আমাদের কাছে সেটা তুচ্ছ খেলনা মাত্র, কিন্তু গোয়েন্দার কাছে কিছুই তুচ্ছ নয়। আর ঐ খেলনাটিকে অবহেলা না করলে খুনীদেরও ফাঁসিকাঠে চড়তে হ'ত না।

বানানো গল্পের গোয়েন্দাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধির খেলা দেখে নিশ্চয়ই তোমরা অবাক হয়ে যাও? কিন্তু অবাক হবার কিছুই নেই। যাঁরা গল্প লেখেন, কল্পনায় ঘটনা সৃষ্টি করেন, পাঠকদের চোখের সুমুখ থেকে কৌশলে অপরাধীদের লুকিয়ে রাখেন, অপরাধীদের ধরবার জন্য মনের-মত ক'রে সূত্র (বা clue) রচনা করেন, তাঁরা নিজেরাই—সেজন্যে গল্পের গোয়েন্দারা কোন বাহাদুরিই দাবি করতে পারেন না। কিন্তু সত্যিকার গোয়েন্দাদের যে কত অকিঞ্চিৎকর প্রমাণ দেখে রীতিমত মাথা খাটিয়ে আসল অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে হয়, তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ খেলার লণ্ঠন।

কন্যান্-ডইল প্রভৃতি অনেক গোয়েন্দা-কাহিনী লেখকের গল্পে দেখা যায়, সত্যিকার পুলিস-কর্মচারীদের স্বেচ্ছায় বোকা বানিয়ে বা ভাঁড় সাজিয়ে গল্পের গোয়েন্দাদের মস্তবড় রূপে দাঁড় করানো হয়েছে। অথচ কন্যান্-ডইল বহু ক্ষেত্রেই সত্যিকার গোয়েন্দাদের দপ্তর থেকেই কাহিনী সংগ্রহ ক'রে তার নায়করূপে খাড়া করেছেন তাঁর কল্পনার মানসপুত্র শার্লক হোম্‌স্‌কে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাঁর রচিত "The Case-book of Sherlock Holmes" এর "Thor Bridge" নামক গল্পটির উল্লেখ করতে পারি। যে সত্য ঘটনা থেকে ঐ গল্পটির উৎপত্তি, আমার আধুনিক রবিনহুড"-এ তা প্রকাশিত হয়েছে।

আর একরকম নিম্নতর শ্রেণীর গোয়েন্দা-কাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয়। তার মধ্যে পাঠকের মস্তিষ্কের খোরাক থাকে যৎসামান্যই, কিন্তু ওর অভাব পূর্ণ করে ঘটনার পর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, মারামারি-হানাহানি, আগ্নেয়-অস্ত্রের গজ্‌রানি, ছোরা-ছুরির চক্‌চকানি! গোয়েন্দারা অতিশয় অসাধারণ মানুষ, কোনরকম বিপদকেই তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না, বোঁ-বোঁ ক'রে গুলি ছুটে আসে আর তারা তুড়ি মেরে

উড়িয়ে দিয়ে বলে—"গোলা খা ডালা'! বিলাতের এড্‌গার ওয়ালেস এবং ই. ফিলিপ্‌স্‌ ওপ্‌ন্‌হিম প্রভৃতি অনেক লেখকই এ রকম অসংখ্য গোয়েন্দা-কাহিনী রচনা করেছেন।

কিন্তু এ-রকম গোয়েন্দা-কাহিনীও অনেক সময়েই সত্যিকার ডিটেকটিভদের কীর্তিকলাপের চেয়ে চমকপ্রদ বা রোমাঞ্চকর নয়। ধরুন, পারী শহরের পৃথিবী-বিখ্যাত বোনট্‌-দলের কথা—কিছুকাল আগে "মৌচাকে"-ই আমি সে-কাহিনী প্রকাশ করেছি। ঐ নাগরিক দস্যুদলকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে সত্যিকার গোয়েন্দারা যে-সব মৃত্যুভীষণ ঘটনার আবর্তে প'ড়েছিল, সেগুলি কোন চিত্তোত্তেজক উপন্যাসে প্রকাশিত হ'লে পাঠকেরা কখনোই সত্য ব'লে বিশ্বাস করবেন না।

এখানে সে-রকম বৃহৎ কোন কাহিনী বলবার জায়গা হবে না, তবে সত্যিকার গোয়েন্দা-ফৌজের মধ্যে যারা কাজ করে, তারা যে কতখানি নির্ভীক ও বেপরোয়া এবং সমূহ বিপদেও তাদের উপস্থিত-বুদ্ধি যে কত বেশী, ফরাসী-পুলিসের একটি কাহিনী থেকেই সেটা প্রমাণিত হ'তে পারে।

পারী শহরের কাছে একটি পুরোনো কেল্লা আছে, তার চারি-পাশের জায়গা ছিল Apacheদের অত্যাচারে ভয়াবহ।

বাংলায় Apacheদের গুণ্ডা বলা ছাড়া উপায় নেই। ফরাসীরা এই শব্দটি নিয়েছে উত্তর-আমেরিকার 'রেড ইণ্ডিয়ান' বা লাল মানুষদের কাছ থেকে। ওখানে Apache বলতে ওদেরই বিশেষ এক জাত বোঝায়। তারা বিষম হিংস্র ও যুদ্ধপ্রিয়; এবং ফরাসী দেশে Apache বলতে তাদেরই বোঝায়, যারা পারী শহরের পথে পথে রাহাজানি খুন-খারাপি করে ও নিরীহ পথিকদের উপরে অত্যাচার করে। –

এম. মেস নামে এক পুলিশ-কর্মচারী প্যারীর গোয়েন্দা-বিভাগের সর্বেসর্বা হয়ে স্থির করলেন, কেল্লা-অঞ্চলের গুণ্ডাদের দমন করতে হবে। তাদের উৎপাত তখন চরমে উঠেছিল—নিত্যই শোনা যায় নরহত্যা, লুটপাট ও দস্যুতার কথা। পথিকরা রাত্রে কেল্লার কাছাকাছি সব পথে আনাগোনা করাই ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু কি ক'রে রক্তপিশাচ গুণ্ডাদের ধরা যায়? প্রকাশ্যে সদলবলে গেলে তাদের কারুর যে দেখা পাওয়া যাবে না, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। মেস তখন ভেবে-চিন্তে একটা উপায় স্থির করলেন।

রাত্রে শখের বাবুর মত গাড়ীতে চ'ড়ে কেল্লার কাছে যেতে আরম্ভ করলেন। সেখানে গিয়ে গাড়ী ছেড়ে নেমে প'ড়ে তিনি বেড়াতেন। তাঁর উপরকার কোটের বোতাম খোলা—বেশ দেখা যায় সোনার চেনওয়ালা ঘড়ি ঝুলছে, হীরার বোতামগুলো করছে চক্‌চক্! তাঁর পা টলোমলো—যেন তিনি অত্যন্ত মাতাল!

গুণ্ডারা চারদিকে গুপ্তস্থানে লুকিয়ে, ওৎ পেতে থাকে শিকারের লোভে। এই অসহায় মাতাল তাদের নজর এড়ায় না। হঠাৎ তারা এসে মেসকে ঘেরাও ক'রে বলে—"হয় কাছে যা আছে দাও, নয় মরো!"

মেস কাকুতি-মিনতি ক'রে সভয়ে বলেন, "মেরো না বাবা, যা চাও দিচ্ছি!"

তারপর গুণ্ডারা যখন তাঁর সোনার চেন-ঘড়ি, হীরার বোতাম ও টাকার ব্যাগ নিয়ে টানাটানি করে, তখন হঠাৎ কড়া গলায় হুকুম আসে—"হাত তোলো, আত্মসমর্পণ কর।"

গুণ্ডারা চমকে মুখ তুলে চেয়ে দেখে, ইতিমধ্যে কখন চারদিক থেকে ছায়ার মতন নিঃশব্দে দলে দলে গোয়েন্দা এসে আবির্ভূত হয়েছে—তাদের প্রত্যেকের হাতেই রিভলবার!

এইভাবে বারে বারে দলে দলে গুণ্ডা ধরা পড়তে লাগল। অন্যান্য গুণ্ডারা ক্ষেপে উঠল। লেনয়র্ নামে এক প্রচণ্ড গুণ্ডা প্রতিজ্ঞা করলে, "আমি মেসের মাথা না নি তো আমার নাম নেই।"

মেসের কানেও সে কথা উঠল। তবু আর একদিন রাত্রে তিনি কেল্লার ধারে বেড়াতে গেলেন। কিন্তু যথাস্থানে গিয়েই তিনি বুঝলেন, তাঁর নিজের লোকজনেরা সেখানে হাজির নেই। তিনি একলা।

জায়গাটা হচ্ছে রীতিমত অন্ধকার। কোথাও কারুর সাড়া নেই।

মেস ফেরবার পথ ধরলেন—সঙ্গে সঙ্গে শুনলেন চারদিকে পায়ের শব্দ। অন্ধকারে জাগলো কতকগুলো ছায়ামূর্তির আভাস।

একটা মূর্তি সামনে এগিয়ে এসে দেশলাই জ্বেলে তাঁর মুখ দেখে বললে, "আরে বাহবা! এ যে দেখছি ধাড়ী শেয়াল নিজেই!"

সে লেনয়র্। সাক্ষাৎ মৃত্যু!

মেস বেশ বুঝলেন এখন একটু ঘাবড়ালেই মৃত্যু নিশ্চিত। তিনি চটপট পরম আনন্দ দেখিয়ে ব'লে উঠলেন, "আরে, আরে, আমার ক্ষুদে খোকা লেনয়র্ যে! তোমাকেই তো আমি খুঁজছিলুম বাছা! এখন আমার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে একবার থানা পর্যন্ত চল দেখি!"

গুণ্ডার দল ভড়কে গেল। মেসের খুশি-ভরা গলার আওয়াজ শুনেই তারা ধ'রে নিলে, অন্য দিনের মত আজও তিনি একাকী নন।

লেনয়র্ বললে, "কেন, আমার নামে কিসের নালিস?"

মেস বললেন, "কোন নালিস নেই। কেবল থানা পর্যন্ত আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে বলছি। ভয় নেই, আমি একলা।"

লেনয়র্ ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানা আছে, পৃথিবীর এ-অঞ্চলে তুমি কতখানি একলা হয়ে বেড়াতে আসো! বেশ, আমি তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি। কিন্তু জেনে রাখো, আমার বিরুদ্ধে তুমি কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না!"

—"এস হে, এস! বলছি আমি একলা, তবু তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না!"

গুণ্ডার দল দেখতে দেখতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। লেনয়র্ চলল মেসের সঙ্গে। মেস নির্বিকারভাবে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে ও আজেবাজে কথা কইতে কইতে অগ্রসর হলেন। লেনয়র্ চুপ।

থানার সামনে এসে ফিরে দাঁড়িয়ে মেস বললেন, "গুড্‌নাইট, লেনয়র্। একলা পথে সঙ্গী হয়েছ ব'লে তোমাকে ধন্যবাদ।"

লেনয়র্ গজ্‌গজিয়ে বললে, "অত আর রসে কাজ কি, যথেষ্ট হয়েছে! আসল কথা বল!"

—"তাই নাকি? তাহ'লে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই না, তুমি চুলোয় যাও।"—ব'লেই মেস থানার ভিতরে ঢুকে গেলেন।

হতভম্ব লেনয়র্ ফ্যালফেলে চোখে দাঁড়িয়ে রইল। সত্যই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই! সত্যই মেস তাহ'লে এতক্ষণ একলা ছিলেন? সত্যই তারা হাতে পেয়েও শত্রুকে ছেড়ে দিলে?

সূত্র কুত্র?

সাধারণতঃ গোয়েন্দা-কাহিনীর লেখকরা কাল্পনিক গোয়েন্দাদের এমন সর্বশক্তিমান ক'রে তোলেন যে, সত্যিকার গোয়েন্দারা তাঁদের কাছে হেরে যান পদে পদে। অথচ অনেক সময়ে সত্যিকার গোয়েন্দাদের কার্যে এমন চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়, যা অতুলনীয় বলা চলে অনায়াসেই।

কাল্পনিক গোয়েন্দাদের মধ্যে সবচেয়ে নামজাদা হচ্ছেন 'সার্লক হোম্‌স্।' যে সব তুচ্ছ 'clue' বা সূত্র, সরকারী—অর্থাৎ সত্যিকার গোয়েন্দাদের দৃষ্টি নাকি এড়িয়ে যায়, সার্লক হোম্‌স্ সেগুলির সাহায্যেই তালেবর অপরাধীদের গ্রেপ্তার ক'রে দস্তুরমত বাহাদুরি দেখাতে পারেন।

কিন্তু সূত্র না পেলে? সার্লক হোম্‌স্ হন নিতান্ত নিঃসহায়। কিন্তু সূত্র না পেলেও সরকারী গোয়েন্দারা অন্ধকারের মধ্যেও যে আলোকের সন্ধান পেতে পারেন, নিম্নলিখিত সত্য কাহিনীটি তারই জলন্ত প্রমাণ।

ঘটনার কাল, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। স্থান, জার্মাণীর বার্লিন শহর।

তুই

বার্লিনের রাজপথের উপরে একখানা প্রকাণ্ড সাততলা-উঁচু অট্টালিকা। তার ফটক (বা সদর দরজা) থাকে দিনে-রাতে সব সময়েই বন্ধ। ফটকের গায়ে আছে একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টার চাবি। কেউ ডাকতে এলে সেই চাবি টিপতে হয়। তখন ফটকের গায়ে একটি ছোট পার্শ্ব-দরজার একখানা পাল্লা খুলে যায়। ভিতর থেকে দ্বারবান আগে উঁকি মেরে আগন্তুককে সন্দিগ্ধ চোখে পরীক্ষা করে। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হ'লে আগন্তুককে সেই পার্শ্ব-দরজা দিয়েই ভেতরে প্রবেশ করতে হয়।

কিন্তু তখনও যাকে ডাকতে আসা হয়েছে, তাঁর দেখা পাওয়া সহজ হয় না। যে ভৃত্যের উপরে থাকে Lift বা উত্তোলন-যন্ত্রের

ভার, সে আগে যথাস্থানে গিয়ে খবর নিয়ে আসে, আগন্তুককে উপরে নিয়ে যাওয়া হবে কিনা? গৃহস্বামী সাক্ষাৎপ্রার্থীর নাম ও উদ্দেশ্য শুনে সম্মতি না দিলে আগন্তুককে বিদায়গ্রহণ করতে হয় ধুলোপায়েই।

এ বাড়ীর বাসিন্দারা পুলিসের সন্দেহভাজন নন, তবু এতটা কড়াক্কড়ির কারণ কি? এখানে বাস করেন এমন সব ব্যক্তি, যাঁদের উপরে ছোঁ মারবার জন্যে অপরাধীরা সর্বদাই ওৎ পেতে থাকে।

এইখানেই রাস্তা থেকে চারতলা উপরে সাতখানা ঘরওয়ালা একটা "ফ্ল্যাট" ভাড়া নিয়ে থাকেন ডাঃ কার্ণ্‌স্টফ। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ রত্ন-বিশেষজ্ঞ, বিখ্যাত জহুরীদের জন্য রত্ন পরীক্ষা করাই তাঁর কাজ। তাঁর কাছে সর্বদাই থাকে নানা শ্রেণীর মহামূল্য রত্ন।

ডাঃ কার্ণ্‌স্টফ চিরকুমার। তাঁর নেই কোন দোসর। একজন বেয়ারা ও একজন পাচক তাঁর গৃহস্থালীর কাজ করে বটে, কিন্তু তারা হচ্ছে ঠিকা লোক। রাত্রে তাদের বিদায় ক'রে তিনি স্বহস্তে নিজের দরজা বন্ধ ক'রে দেন।

তিন

এক সকালে বেয়ারা ও পাচক এসে কড়া নেড়ে নেড়ে হয়রান হয়ে পড়ল, তবু ডাঃ কার্ণ্‌স্টফের ঘরের দরজা খুলল না।

ভয় পেয়ে তারা থানায় খবর দিলে। পুলিস এসে দেখলে, ভিতরে ঢুকবার অন্য কোন উপায়ই নেই। তখন বাধ্য হয়ে তারা ভেঙে ফেললে দরজা। ভিতরে প্রবেশ ক'রে দেখা গেল ভয়াবহ দৃশ্য।

ডাঃ কার্ণ্‌স্টফ নিহত। ঘরের মেঝের উপরে তাঁর মৃতদেহ প'ড়ে

রয়েছে, তাঁর কপালের উপরে কেউ কোন ভোঁতা জিনিস দিয়ে প্রচণ্ড এক আঘাত করেছে, কিন্তু অস্ত্রটার খোঁজ পাওয়া গেল না।

ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। সেই চারতলা-উঁচু ঘরের ভিতরে গবাক্ষপথে প্রবেশ করাও অসম্ভব এবং কেউ প্রবেশ করলেও জানলার চৌকাঠের আশেপাশে ধূলার উপরে তার পদচিহ্ন পাওয়া যেত। কোথাও কারুর হাতের আঙুলেরও ছাপ নেই। বাড়ীর তাবৎ লোক-জন ও দাসদাসীর কুলজী ও পূর্ববৃত্তান্ত তন্ন তন্ন ক'রে পরীক্ষা করা হ'ল। ঘাঁটির পাহারাওয়ালাও সে রাত্রে কোন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে দেখেনি। খুনের উদ্দেশ্যও খুঁজে পাওয়া গেল না, কারণ ঘরের ভিতর থেকে একখণ্ড রত্নও অদৃশ্য হয়নি এবং ডাঃ কার্ণ্স্টফ হচ্ছেন অজাতশত্রু।

এ মামলার ভার পেলে কাল্পনিক গোয়েন্দাদের শিরোমণি সার্লক হোম্স্ পর্যন্ত তাঁর সহচরকে ডেকে হতাশভাবে বলতেন, "ওয়াটসন, কোন সূত্রই নেই যে! আমি হার মানলুম!"

চার

কিন্তু বার্লিনের সরকারী পুলিস হার মানতে নারাজ। তারা বললে, "কোন সূত্র নেই? বহুৎ আচ্ছা! তাহ'লে এ মামলার কোন সূত্রই নেই, এইটেই হ'চ্ছে প্রধান সূত্র।"

সত্যিকার গোয়েন্দা মাথা ঘামিয়ে বললেন, "খুঁজে দেখ সেই সব অপরাধীকে, যারা ঘটনাস্থলে কোন সূত্রই রেখে যায় না।"

পুলিসের সবাই জানে, এক এক শ্রেণীর অপরাধী এক এক বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ করে। জার্মাণ পুলিসের কাছে আছে দুই কোটি কার্ড। এক এক কার্ডে আছে এক এক অপরাধীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

কে কোন্ শ্রেণীর অপরাধী এবং কে কোন্ পদ্ধতিতে কাজ করে, এই সব কথা।

গোয়েন্দা বললেন, "ডাঃ কার্ণস্টফকে যে খুন করেছে, সমস্ত সূত্র লুপ্ত ক'রে দেবার কৌশল সে জানে। দু-চার দিনে এমন কৌশলী হওয়া যায় না। সুতরাং সে যে পুরাতন পাকা অপরাধী, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। পুলিসের record বা নথি খুঁজলে নিশ্চয়ই তার সন্ধান পাওয়া যাবে।"

নথি হাতড়াতে হাতড়াতে একটি ঘটনা পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ডার্মস্টাডট্ শহরে একটি দুর্ভেদ্য বাড়ীতে চুরি হয়ে গিয়েছিল। চোর বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করেছিল ছাদের উপর থেকে দড়ি ঝুলিয়ে গবাক্ষ-পথ দিয়ে।

বার্লিনের পুলিসও ধরলে এই সূত্রের খেই। কার্ণস্টফের সাততলা বাড়ীর ছাদের উপরটা তারা পরীক্ষা করতে গেল। য়ুরোপের অধিকাংশ বাড়ীর গড়ানে ছাদের উপরে থাকে ধোঁয়া বেরুবার চিম্‌নি —এখানেও তাই ছিল। দেখা গেল, চিম্‌নির গায়ে রয়েছে ঘষড়ানির চিহ্ন! পুলিস সেটা দড়ির দাগ ব'লেই স্থির করলে।

কিন্তু একে কার্ণস্টফের বাড়ীর কোন দিকেই অন্য কোন বাড়ী নেই, তার উপরে এই অট্টালিকাখানা হচ্ছে সাততলা উঁচু। নীচে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে কেউ কি মানুষের ভার সইতে পারে, এমন মোটা দড়ি ছাদের উপরে যথাস্থানে নিক্ষেপ করতে পারে?

পুলিসই এই সমস্যা-সমাধানের ভার গ্রহণ করলে।

প্রথমে তারা একগাছা সরু ফিতার ডগায় একখানা পাথর বেঁধে নিলে। বার-কয়েক চেষ্টার পর রাস্তা থেকে ছুঁড়ে সেই ফিতাগাছা ফেলা হ'ল ঠিক ছাদের চিমনির উপরে। তারপর চিমনিকে বেষ্টন

ক'রে সেই ফিতাগাছ পাথরের ভারে ঢালু ছাদের উপর দিয়ে আবার রাস্তায় এসে পড়ল। তারপর সেই ফিতার সঙ্গে মোটা দড়ি বেঁধে ছাদের উপরে তুলে আবার রাস্তায় নামিয়ে আনা হ'ল। তারপর সেই দড়ির সাহায্যে একজন গোয়েন্দা ছাদের উপরে গিয়ে উঠল।

তখন পুলিসের মানসনেত্রের সামনে জেগে উঠল জনৈক চোরের আব্‌ছা-আব্‌ছা মূর্তি। সে পরের বাড়ীর ভিতরে অনধিকার প্রবেশ করবার জন্যে এক নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। খুব সম্ভব পূর্বজীবনে তার এমন কোন পেশা ছিল, যার জন্যে তাকে কাজ করতে হ'ত খুব উঁচু জায়গায় উঠে। হয়তো সে ছিল রাজমিস্ত্রী বা ঐ-রকম আর কিছু।

পাঁচ

সেইরকম কোন চোরের সন্ধানে আবার নথি-পত্র ঘাঁটা শুরু হ'ল। পাওয়া গেল ঐ শ্রেণীর দশ জন দাগী আসামীর সন্ধান। তাদের মধ্যে দুইজন মৃত ; তিনজন জেল খাটছে এবং পাঁচজন স্বাধীন।

পুলিস খোঁজখবর নিয়ে দুইজনকে সন্দেহ থেকে মুক্তি দিলে। বাকি রইল তিনজন এবং তাদের মধ্যে বিশেষ ক'রে একজনকে নিয়ে গোয়েন্দারা মাথা ঘামাতে লাগল।

তার নাম জোহান। সে আগে রাজমিস্ত্রীর কাজ করত। পরে ধরে চুরি-ব্যবসায়। বয়স উনত্রিশ বৎসর। হামবুর্গ শহরের এক বাড়ীর তিনতলা ঘরে ঢুকে চুরি করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে এবং জেল খাটে। মুক্তি পেয়ে এখনো সে অপরাধীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে ছাড়েনি।

পুলিস জোহানকে খুঁজতে লাগল, কিন্তু তার কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।

কিন্তু এক ছোকরার সন্ধান পাওয়া গেল, নাম তার ফ্রিট্‌জ্। বয়স আঠারো বৎসর। সে এখনো জেলে যায়নি বটে, কিন্তু দাগী অপরাধীরা তাকে দিয়ে প্রায় ফাই-ফরমাশ খাটিয়ে নিত। প্রকাশ পেলো, জোহানের সঙ্গে তার ছিল খুব দহরম-মহরম। পুলিস তারই পিছু ধরলে।

একটা কফিখানা ছিল, সেখানে আড্ডা দিত যত চোর আর বদমাশ। দেখা গেল, ফ্রিট্‌জ্ রোজই কফিখানার একটা পিছনকার ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢোকে এবং খানিক পরে আবার বেরিয়ে আসে।

পুলিসের একটা চর একদিন মাতলামির ভান ক'রে ফ্রিট্‌জের পিছু-পিছু সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। কিন্তু কি আশ্চর্য, ঘরের মধ্যে নেই জনপ্রাণী!

কফিখানার মালিক হাঁ হাঁ ক'রে তেড়ে এল—"ও ঘরে তুই কেন রে? মেরে গতর চূর্ণ ক'রে দেব তা জানিস্?"

খানিক পরে দেখা গেল, ফ্রিট্‌জ আবার সেই ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

ছয়

তখন ফ্রিট্‌জকে ধ'রে শুরু হ'ল জিজ্ঞাসাবাদ।

—"কে আছে ও ঘরে? কোথায় সে লুকিয়ে আছে?"

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফ্রিট্‌জ্ বললে, "আমি জেলে যাব তবু বলব না। তাহ'লে সে আমাকে খুন করবে!"

একদল পাহারাওয়ালা নিয়ে গোয়েন্দারা গেল সেই ঘরের ভিতরে। তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজবার পর আলমারির তলায় মেঝের উপরে পাওয়া গেল একটা কাটা-দরজা। তার তলায় চোরকুঠরি।

—"কে আছ ওখানে? সাড়া দাও!"

কারুর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। একখান মই আনিয়ে পাহারাওয়ালারা নীচে নামতে লাগল।

কিন্তু তারপরেই রব উঠল—"পালাও, পালাও!"

পাহারাওয়ালারা হুড়মুড় ক'রে উপরে উঠে মেঝের উপরে প'ড়ে বিষম যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল।

—"ব্যাপার কি, ব্যাপার কি?"

—"গ্যাস! গ্যাস!"

নতুন একদল পাহারাওয়ালা এল অনতিবিলম্বে। তাদের সকলেরই মুখে গ্যাসের মুখোস। তারা ইলেকট্রিক টর্চ্চ জ্বেলে আবার চোরকুঠরীর ভিতরে নামতে লাগল। প্রতিপদেই তাদের আশঙ্কা, এই বুঝি কোন মরীয়া আততায়ী রিভলভার থেকে গুলিবৃষ্টি করে।

কিন্তু কেউ রিভলভার থেকে গুলি ছুঁড়লে না। সেখানে পাওয়া গেল যাতনায় কুঁকড়ে-পড়া একটা মানুষের দেহ। তারও মুখে গ্যাসের মুখোস।

দেহটাকে উপরে তুলে আনা হ'ল। মুখোসের তলায় ছিল জোহানের মুখ! মারাত্মক ক্লোরিণ গ্যাসের সাহায্যে সে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারলে না। কারণ তার মুখোসটায় ছিল ছ্যাঁদা।

জোহান বাঁচল না। কিন্তু মারা পড়বার আগে স্বীকার করলে নিজের অপরাধ। ডাঃ কার্ণস্টফের দ্বারা আক্রান্ত হয়েই সে নাকি তাঁকে খুন করতে বাধ্য হয়। তারপর ভয় পেয়ে কিছু চুরি না ক'রেই সে পালিয়ে আসে।

মুক্তি

প্রমথবাবু বললেন, 'পুলিনবাবু, ভূত বলতে আপনি কি বোঝেন ?'

—'দেহমুক্ত আত্মা। নশ্বর দেহের অস্তিত্ব না থাকলেও যে আবার সেই দেহ ধারণ ক'রে পৃথিবীর মানুষকে দেখা দেয়।'

—'কিন্তু আমি যদি ও-কথা না মানি ? আমি যদি বলি, মৃত্যু হচ্ছে চিরনিদ্রা ? মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা আর জাগে না ?'

আমি সবিস্ময়ে বললুম, 'এ কথা আপনি বলবেন কেমন ক'রে ? সকলেই জানে, আপনি হচ্ছেন একজন বিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিদ্। প্রেতের অস্তিত্ব না থাকলে আপনি প্রেততত্ত্ব নিয়ে আলোচনা ক'রে সময় নষ্ট করতেন না।'

প্রমথবাবু একটু হেসে বললেন, 'প্রেততত্ত্ব নিয়ে আলোচনা ক'রেই আমি এই সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি যে, মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মা চিরকালের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ে। সে আর জাগে না, জাগাতে পারে না।'

—'তাহ'লে মানুষ মরা লোককে আবার দেখতে পায় কেন ?'

—'আপনারা যাকে বলেন ভূত, আমার মনে হয়, সেটা হচ্ছে প্রপঞ্চ বা 'ইলিউসান'।

—'অর্থাৎ মিথ্যা মায়া।'

—'ঠিক তাই।'

—'তাহ'লে ভূত ব'লে কিছুই নেই ?'

—'একটা কিছু আছে বৈ কি ! কিন্তু লোকে যাকে ভূত বলে, আমি তাকে বলি চিন্তার মূর্তি।'

—'চিন্তার মূর্তি ?'

—'হ্যাঁ।'

—'মানে বুঝলুম না।'

—'মুখের কথায় সহজে বুঝতে পারবেন না। তবে এই রকম মূর্তি যদি স্বচক্ষে দেখতে চান, আমি আপনাকে দেখাতে পারি।'

—'কোথায়' ?

কাঁচড়াপাড়ায় একখানা বাড়ী 'হানাবাড়ী' ব'লে বিখ্যাত। প্রতি বৎসর কালীপুজোর রাত্রে সেখানে একই দৃশ্যের পুনরভিনয় হয়। গেল বছরে আমি নিজে সেখানে উপস্থিত থেকে সেই দৃশ্য দেখে এসেছি। আর সাত দিন পরে এ বছরের কালীপূজো। আপনিও কি সেই দৃশ্য দেখতে চান ?"

—'বিপদে পড়ব না তো ?'

—'বিপদ ? এ-রকম দৃশ্য দেখে মানুষ বিপদে পড়ে নিজেই ভয় পেয়ে। নির্ভীকের বিপদ নেই। বিশেষ, আমি যখন সঙ্গে আছি, বিপদে পড়বার বা ভয় পাবার কোন কারণই নেই।'

ভূত মানি, কিন্তু ভূত কখনও দেখিনি, আর দেখবার ভরসাও নেই। কিন্তু প্রমথবাবুর কথায় মনে জাগল কৌতূহল। একটু ইতস্তত ক'রে রাজী হয়ে গেলুম।

দুই

কালীপুজোর দিন। বৈকাল বেলা। পুরাতন কাঁচড়াপাড়ার একটি প্রশস্ত রাজপথ। লোকজনের চলাচল খুব কম। সারি সারি বাড়ীর পর বাড়ী—অনেক বাড়ীই প্রাসাদের মত বৃহৎ। কিন্তু প্রত্যেক বাড়ীই পরিত্যক্ত, বাসিন্দারা ম্যালেরিয়ার ভয়ে বসত-

বাড়ী ছেড়ে পলায়ন করেছে। বাড়ীগুলোর চারদিক বেষ্টন ক'রে আছে ঘন জঙ্গল, তাদের বিবর্ণ দেয়ালগুলো ফুঁড়ে আত্মপ্রকাশ করেছে অশ্বত্থ, বট ও নিম গাছের জঙ্গল। এই নিস্তব্ধ নির্জন, মৃত শহরের ভেতর থেকে মাঝে মাঝে কেবল ভেসে আসছে ঘুঘুর করুণ কান্নার সুর।

ওমর খৈয়মের লাইন মনে পড়ল—

'রাজার বাড়ীর থামের সারি আকাশ-ছোঁয়া তুলত মাথা,
রতন-মুকুট পরে হোথায় সোনার তোরণ ধরত ছাতা।
আজ সেখানে আঁধুল মায়ায় বিজন ছায়া দুলিয়ে দিয়ে।
'ঘুঘুঘুঘু'র আকুল স্বরে গাইছে কপোত কাতর গাথা।'

বললুম, 'প্রমথবাবু, এমন জায়গায় ভূত থাকবে না তো আর কোথায় থাকবে বলুন?'

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে একদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে তিনি বললেন, 'আমরা আজ ঐ বাড়ীখানার ভেতরে রাত্রিবাস করব।'

সেখানাও মস্তবড় বাড়ী, তারও সর্বাঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে বন্য গাছের দল এবং তাকেও লোকচক্ষুর আড়ালে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে রীতিমত একটি অরণ্য। বহুস্থলেই চুন-বালি খ'সে বেরিয়ে পড়েছে বুড়ো বাড়ীর ইষ্টক-কঙ্কাল। দেখলেই বুক ছাঁৎ-ছাঁৎ করে, মনে হয় ওটা যেন অভিশপ্ত বাড়ী। মানুষ হচ্ছে বসতবাড়ীর আত্মার মত। জনশূন্য বাড়ী দেখলে আমার আত্মাহীন মৃতদেহের কথা মনে হয়। হা হা করতে থাকে মন।

প্রমথবাবু বললেন, 'চলুন, এখন আমার বন্ধু সুবোধের ওখানে গিয়ে উঠি। আমার চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই সে হানাবাড়ীর একখানা ঘর আমাদের রাত্রিবাসের উপযোগী ক'রে রেখেছে। সন্ধ্যাবেলাতেই

আহারাদি সেরে নিয়ে যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে যে-কোন দৃশ্য দেখবার জন্যে প্রস্তুত থাকব।'

তিন

দুজনেই একটা ক'রে হারিকেন লণ্ঠন হাতে নিয়ে, সাবধানে নড়বোড়ে সিঁড়ি মাড়িয়ে দোতালায় উঠে একখানা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলুম।

রাত তখন আটটা। এরই মধ্যে একেবারে নীরব হয়ে পড়েছে মানুষের কণ্ঠস্বর এবং আশপাশ থেকে ঝিল্লীরা শুরু করেছে তাদের কণ্ঠসাধনা। ঘুটঘুটে অন্ধকারমাখা রাত্রি, মাঝে মাঝে শোনা যায় বাদুড়দের ডানার ঝট্‌পটানি।

প্রকাণ্ড হলঘর। পঙ্কের কাজ-করা দেওয়াল অযত্নে মলিন। মার্বেল পাথরের মেঝে, কিন্তু তার উপরে বিছানো আছে কত কাল ধ'রে সঞ্চিত ধুলোর আস্তরণ। কোথাও কোন আসবাব নেই। জানলাগুলোর কোনটা খোলা, কোনটা বন্ধ।

ঘরের একটা কোণ আমাদের জন্যে পরিষ্কার ক'রে রাখা হয়েছে। আর আছে দুখানা ইজি-চেয়ার।

আমার হাত ধ'রে প্রমথবাবু বললেন, 'চলুন, পাশের ঘরখানা দেখে আসি।'

এ-ঘরের ভিতর দিয়েই পাশের ঘরে যাবার দরজা।

পুরু ধুলোয় ভরা ছোট ঘর। আসবাবের মধ্যে একখানা শয্যাহীন সেকেলে পালঙ্ক। জানালাগুলো বন্ধ।

আচম্বিতে আমার বুকটা ধড়াস্‌ ক'রে উঠল, গায়ে দিলে কাঁটা!

মনে হ'ল এ-ঘরের বদ্ধ বাতাসের মধ্যে সজাগ হয়ে আছে কোন অজানা ও অদৃশ্য আতঙ্ক।

প্রমথমবাবু ফিরে আমার কাঁধের উপরে একখানা হাত রেখে সুধোলেন, 'কিছু অনুভব করছেন?'

—'করছি।'

—'আমরা ছাড়া অন্য কারুর উপস্থিতি?'

—'হ্যাঁ।'

—চলুন, হলঘরে গিয়ে বসি।'

হলঘরে এলুম। দুজনে দখল করলুম এক-একখানা ইজি-চেয়ার। নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে কেটে গেল প্রায় দশবারো মিনিট। কথা বলবার ইচ্ছেও হ'ল না। মনের ভিতরে কেমন একটা অহেতুকী অস্বাচ্ছন্দ্য।

জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকালুম। কষ্টিপাথরের মত জমাট অন্ধকার। থেকে থেকে গায়ে এসে লাগছে একটা শীতার্ত বাতাসের কন্‌কনে নিশ্বাস।

হঠাৎ মনে হ'ল, আমার চোখের সামনে নেমে এসেছে যেন পাতলা কাঁচের মত স্বচ্ছ পর্দা এবং তারই ভিতর দিয়ে দেখছি ঘরের অন্য অংশটা।

প্রমথবাবুর দিকে ফিরে দেখলুম। কোন দিকে দৃকপাত না ক'রে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন তিনি।

তারপরেই সচমকে আমি নিজের পা দুটো চেয়ারের উপরে তুলে ফেললুম।

প্রমথবাবু বললেন, 'কি?'

—'আমার পা ধ'রে কে টানছে!'

—'টানছে?'

—'না, ঠিক তা নয়। আমি কারুর হাতের স্পর্শ পাই নি। কিন্তু কি এক আকর্ষণে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পা দুটো চেয়ারের তলায় চ'লে যাচ্ছিল।'

প্রমথবাবু একটু হেসে বললেন, 'মনের ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা অস্বাভাবিক কিছু দেখবার আশায় অপেক্ষা করছি। এ সময়ে ও-রকম মনের ভ্রম হ'তে পারে।'

হোক্‌গে মনের ভ্রম। আমি আর নিচে পা নামালুম না।

চার

তারপর, এই খানিক আগে পাশের যে খালি ছোট ঘরখানায় গিয়েছিলুম, তার ভেতর থেকে পেলুম দুটো গলার আওয়াজ! একজন স্ত্রীলোক ও একজন পুরুষ কথা কইছে অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে।

প্রমথবাবু শান্তভাবে বললেন, 'গেল বছর কালীপুজোর রাত্রেও আমি ঐ দুটো গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলুম।'

তাঁর মুখের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই ভয়াবহ নারীকণ্ঠের আর্তনাদের পর আর্তনাদে রাত্রির স্তব্ধতা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল! প্রথমে অত্যন্ত উচ্চস্বরে জেগে উঠে, তারপর ধীরে ধীরে মন্দীভূত হয়ে এল সে চীৎকার। একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার সর্বাঙ্গ।

হঠাৎ পাশের ঘরের দরজাটা খুলে গেল সশব্দে। ঝড়ের মত বেগে বেরিয়ে এল একটা উন্মত্তের মত বীভৎস মূর্তি—হাতে তার রক্তাক্ত শাণিত ছোরা। সে তাড়াতাড়ি ছুটে একটা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে কি দেখলে,

আবার দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে পড়ল, তারপর আবার ছুটে ফিরে এল ঘরের ভিতরে এবং পরমুহূর্তে ছোরাখানা সজোরে আমূল বসিয়ে দিলে নিজের বুকের উপরে! তারপর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বারকয়েক ছটফট ক'রে মূর্তিটা স্থির হয়ে গেল, তার বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল ঝলকে ঝলকে রক্ত!

এক লাফে আমি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলুম উদ্‌ভ্রান্তের মত।

প্রমথবাবু বললেন, 'ওকি, কোথা যান?'

আমি আর্তস্বরে বললুম, 'এ দৃশ্য দেখবার পর আর আমি এখানে থাকতে পারব না।'

—'দৃশ্য? এখানে আর কোন দৃশ্যই নেই। ফিরে দেখুন।'

ফিরে দেখে আমি একেবারে হতভম্ব। ঘরের ভেতরে কোথায় সেই ভয়ানক দৃশ্য, কোথায় সেই বীভৎস মূর্তি, কোথায় সেই রক্তের ধারা? কিছুই নেই, সব অদৃশ্য!

বাধো বাধো গলায় বললুম, 'এতক্ষণ কি আমি স্বপ্ন দেখছিলুম?'

প্রমথবাবু বললেন, 'প্রপঞ্চ। আর এখানে কিছুই দেখা যাবে না। নিন, এইবারের ইজি-চেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন।'

—'অসম্ভব। এখানে আমার চোখে আর ঘুম আসবে না।'

—'উত্তম। তাহ'লে জেগে জেগে আমার নাসিকার সঙ্গীত শ্রবণ করুন।'

পাঁচ

সকাল বেলায় প্রমথবাবু বললেন, 'কত বছর আগে তা জানি না, এই বাড়ীতে কালীপুজোর রাত্রে একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে হত্যা

করেছিল। স্ত্রীর আর্তনাদ শুনে চারিদিক থেকে পাড়াপড়শীরা এসে পড়ে। হত্যাকারী জানালা দিয়ে তাদের দেখে বাড়ীর ভেতরের অন্য পথ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে পথও বন্ধ দেখে শেষটা সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়।'

আমি বললুম, 'আমরা কি আজ তারই প্রেতাত্মা দেখলুম ?'

—'প্রেতাত্মার নয়, তার চিন্তার মূর্তি।'

—'চিন্তার মূর্তি কি ?'

—'উগ্র বা তীব্র বা প্রচণ্ড চিন্তা ঈথরের (ether) ভেতরে একটা ছাপ রেখে যায়। মানুষের দেহ নষ্ট হ'লেও ঈথরের ভেতরে সেই চিন্তার অস্তিত্ব লোপ পায় না। ক্ষেত্রবিশেষে নির্দিষ্ট দিনে আবার তা মূর্তি ধ'রে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

—'এ কি অসম্ভব কথা !'

—'বেতারে মানুষের কণ্ঠস্বর আর মূর্তি ধ'রে বিলাত থেকে এদেশেও পাঠানো হচ্ছে। তার রেকর্ড চিরস্থায়ী করে রাখা যায়। সেটা আপনারা অসম্ভব মনে করেন না। তবে ঈথরের মধ্যেই বা চিন্তার মূর্তি ধ'রে রাখা যাবে না কেন ?'

আমি বৈজ্ঞানিকও নই, প্রেততত্ত্ববিদ্‌ও নই, কাজেই এ জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারলুম না।

পেপির দক্ষিণ পদ

বিলাত থেকে বাংলাদেশে ফিরছি।

জাহাজ যখন এডেন বন্দরে, একজন বুড়ো আরব আমার সামনে মোট নামিয়ে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে শুধোলে, "কিউরিও কিনবেন? ভালো ভালো কিউরিও।"

কিউরিও কেনবার বাতিক আমার ছিল। কলকাতায় আমার বৈঠকখানা দেখে বন্ধুরা মত প্রকাশ করত, ঘরখানাকে আমি প্রায় ছোটখাটো মিউজিয়ম ক'রে তুলেছি—কারণ সেখানে দিকে দিকে সাজানো ছিল দেশ-বিদেশের নানান শিল্প ও কৌতুক সামগ্রীর নমুনা।

বুড়ো আরবটাকে সাগ্রহে বললুম, "খোলো তোমার মোট, দেখাও তোমার মাল।"

মোটের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল রকম-বেরকম জিনিস। বেশীর ভাগই আজে-বাজে ছেলেখেলার সামিল। কিন্তু একটি জিনিস বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

চোখে দেখে আমার মনের ভাব বুঝে চালাক আরবটা বললে, "ওটি হচ্ছে দুর্লভ পদার্থ। চার হাজার বছর আগেকার মমির পা।"

প্রাচীন মিশরের সুরক্ষিত, বিশুষ্ক মৃতদেহের কথা সকলেই শুনেছে। মিশরের বা আধুনিক ইজিপ্টের যাদুঘরে আমি অনেক মমি দেখেছি। কলকাতায় যাদুঘরেও মমির একটি নিদর্শন আছে—যদিও তার অবস্থা ভালো নয়। কিন্তু এই বুড়ো আরবটা যা দেখালে, তা গোটা মমি নয়—বিশুষ্ক মনুষ্য-দেহের হাঁটুর নিচে থেকে কেটে নেওয়া একখানা পা মাত্র। একেবারে নিখুঁত পা, তার কোন অংশই একটুও নষ্ট হয় নি।

জিজ্ঞাসা করলুম, "গোটা মমিটা কোথায় গেল?"

সে বললে, "কেউ তা জানে না। মহাশয়, এই মমির পায়ের ইতিহাস আছে। প্রায় চার হাজার বছর আগে প্রথম মেন্টুহোটেপ যখন মিশরের রাজা, তখন শেয়ালমুখো দেবতা আনুবিসের মন্দিরে এক পুরোহিত ছিল, নাম তার পেপি। কি কারণে জানি না, রাজা মেন্টুহোটেপের হুকুমে পেপির প্রাণদণ্ড হয়। ঘাতক আগে তার দুই হাত আর দুই পা একে একে কেটে নেয়, তারপর করে মুণ্ডচ্ছেদ। অনেক চেষ্টার পর আমি কেবল পেপির এই ডান পা-খানা সংগ্রহ করতে পেরেছি।"

আমি বুঝলুম, বুড়োর এই বাজে গালগল্পটা ব্যবসাদারির একটা চাল মাত্র। তা নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে, খানিকক্ষণ দরদস্তুরের পর মমির সেই পা-খানা আমি কিনে ফেললুম।

জাহাজের কাপ্তেন সেইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি কি কিনেছি দেখে গম্ভীর হয়ে বললেন, "মিঃ সেন, এ-সব জিনিস কেনার খেয়াল ভালো নয়। ইজিপ্টের মমিকে তার স্বদেশের বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রে আমার কোন কোন বন্ধু সমূহ বিপদে পড়েছেন—কারণ সেটা হচ্ছে পবিত্র বস্তুর অপব্যবহার।"

কাপ্তেনের কথা হেসেই উড়িয়ে দিলুম।

দুই

কলকাতায় বাড়ীতে ফিরে আসতেই আমার মা করলেন মমির এই দক্ষিণ পদের বিরুদ্ধে বিষম বিদ্রোহ-ঘোষণা।

স্পষ্ট ফতোয়া দিলেন, "আমার বাড়ীতে ঐ পচা মড়ার ঠাঁই হবে না।"

আমি বললুম, "পচা নয় মা, শুকনো। এই যেমন শুঁটকী মাছ আর কী! অনেকে কি শুঁটকী মাছ খায় না?"

মায়ের নাসিকাযন্ত্রকে সত্যসত্যই যেন আক্রমণ করলে কোন উৎকট দুর্গন্ধ। তাড়াতাড়ি নাকে কাপড় চাপা দিয়ে তিনি ব'লে উঠলেন, "ওরে পিশাচ, থুঃ থুঃ থুঃ। ম্লেচ্ছের মুল্লুকে গিয়ে তুই কী শুঁটকী মড়াও খেতে শিখেছিস্?"

অনেক চেষ্টা ও খোশামোদের পর শেষ পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে এই রফাই হ'ল যে, পুরোহিত পেপির দক্ষিণ পদখানি অতঃপর বিরাজ করবে সদর-মহলে একতলার বৈঠকখানায় 'গ্লাস-কেস'-এর মধ্যে এবং কোন ওজরেই তাকে নিয়ে আমি বাড়ীর উপরতলায় উঠতে বা অন্দর-মহলে প্রবেশ করতে পারব না।

তিন

তেরাত্রি পোয়াতে না পোয়াতে যে-সব ঘটনা ঘটতে লাগল, তার কোন মানে হয় না।

এক সকালে ঘরের বাইরে এসেই শুনলুম, মহা শোরগোল শুরু ক'রে দিয়েছে আমাদের দ্বারবান।

কাল রাত্রে সে নাকি নিজের হাতে সদর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু আজ ভোরবেলায় উঠে দেখে, দরজা কে দোহাট ক'রে খুলে দিয়েছে!

কিন্তু তারও চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার দেখে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল।

দরজার সামনে চলনপথে পড়ে রয়েছে পুরোহিত পেপির কর্তিত দক্ষিণ পদ!

এই পা-খানাকে আমি স্বহস্তে রেখে দিয়েছিলুম বৈঠকখানার চাবিবন্ধ 'গ্লাস-কেস'-এর ভিতরে এবং সে ঘরের দরজাও ছিল বাহির থেকে তালাবন্ধ!

চার

এ অঞ্চলের থানার ইনস্পেক্টর নবীন হচ্ছে আমার বন্ধু।

আজ সকালেও আমাদের সদর দরজা ছিল খোলা এবং সেই হতচ্ছাড়া কাটা ডান পা-খানা পড়ে ছিল চলন-পথের উপরে! বলা বাহুল্য, আজও সে সচল হয়ে বেরিয়ে এসেছে তালাবন্ধ ঘরের চাবিবন্ধ 'গ্লাস-কেস'-এর ভেতর থেকে!

আড়ষ্ট ও নিরুপায় ভাবে তার দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে নবীনের প্রবেশ। এসেই সে বললে, "ওহে, কাল নিশুত রাতে এমন একটা ব্যাপার দেখেছি, যা আজব বলাও চলে।"

'আজব ব্যাপার? কোথায়?'

—'তোমাদের সদর দরজার সামনে।'

—'তার মানে?'

—'রোঁদে বেরিয়েছিলুম। হঠাৎ দেখি, আমাদের আগে আগে যাচ্ছে একটা মস্ত ঢ্যাঙা মূর্তি। মাথা-সমান-উঁচু একগাছা লাঠির উপরে ভর দিয়ে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথ চলছিল।'

—'খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে?'

—'হ্যাঁ। পথের আধা-আলো আর আধা-অন্ধকারে তাকে ভালো ক'রে দেখা যাচ্ছিল না। তবু মনে হ'ল সে বিদেশী, আর তার ডান পা-খানা নেই।'

আমি রুদ্ধশ্বাসে শুধালাম, 'তারপর ?'

—'লোকটা যখন তোমাদের বাড়ীর সদর দরজা পর্যন্ত এসেছে, তখন আমার কেমন সন্দেহ হ'ল। আমি তাকে চেঁচিয়ে 'চ্যালেঞ্জ' করলুম। সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্তিটা—বললে তুমি বিশ্বাস করবে না—ঠিক যেন বাতাসের সঙ্গে একেবারে মিলিয়ে গেল! এমন আশ্চর্য চোখের ভ্রম আমার আর কখনো হয় নি।'

এ কথার উত্তরে কোনরকম উচ্চবাচ্য করা আমি বুদ্ধিমানের কাজ ব'লে মনে করলুম না।

পাঁচ

এবারে চূড়ান্ত ঘটনা।

যদি কোন বিশেষজ্ঞ এই ঘটনা শোনেন, তবে তিনিই বলতে পারবেন, আমি স্বপ্নচারণ-রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলুম, না, যা দেখেছিলুম তা হচ্ছে 'হ্যালসিনেশন্' বা ভ্রান্তি মাত্র।

সে রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল আচম্‌কা।

তিনতলার ছাদের উপরে স্পষ্ট শুনলুম ধুপ্, ধুপ্, ধুপ্, শব্দ। যেন কে ভারী ভারী পা ফেলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে ছাদের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত!

চোর নাকি ? কিন্তু চোর কি পদচারণা করবে এমন সশব্দে ?

দৌড়ে গিয়ে উঠলুম ছাদের উপরে। অন্ধকার ঘুটঘুটে রাত। কিন্তু দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ ক'রে ফুটে উঠেছে এক অদ্ভুত মূর্তি! ঠিক যেন পুরু অথচ স্বচ্ছ কালো মেঘ-দিয়ে-গড়া এক আশ্চর্য মনুষ্যদেহ এবং তার মেঘবরণ মুখমণ্ডলের মধ্যে জ্বলছে স্থির বিদ্যুৎবর্ত্তুলের মত দুটো নিস্পন্দ চক্ষু!

স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলুম—দুই মিনিট, কি দুই ঘণ্টা, জানি না!······

আচম্বিতে যেন অন্য জগৎ থেকেই জেগে উঠল ভোরের পাখিদের প্রথম কাকলি।

সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম বীভৎস আর্তনাদ! সভয়ে রোমাঞ্চিত দেহে দেখলুম, সেই অসম্ভব মূর্তিটার বাম-হাতখানা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছাদের উপরে গিয়ে ঠিকরে পড়ল,—তারপর আবার আর্তনাদ এবং বিচ্ছিন্ন হ'ল তার ডান বাহু,—আবার আর্তনাদ এবং এবারে বিচ্ছিন্ন হ'ল বাম পদ,—তারপর মূর্তিটা একেবারে শুয়ে পড়ে আবার আর্তনাদ ক'রে উঠল এবং তার বিচ্ছিন্ন দক্ষিণ পদখানা নিক্ষিপ্ত হ'ল আমার পায়ের কাছে! তারপর আর আর্তনাদ শুনলুম না, কেবল দেখলুম মূর্তির ধড় থেকে বিযুক্ত হয়ে গেল মুণ্ডটা, নিবে গেল দুটো অগ্নিচক্ষু এবং ফিন্‌কি দিয়ে ছুটতে লাগল রক্ত, আর রক্ত আর রক্ত!

আর আমি সইতে পারলুম না, মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম সেইখানেই।

ছাদের উপরেই চোখ মেললুম প্রথম রোদের ছোঁয়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।

আমি একলা। কেবল আমার পাশে পড়ে রয়েছে মমির সেই দক্ষিণ পদ।

সেই অভিশপ্ত বস্তুটাকে গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়ে স্নান ক'রে বাড়ীতে ফিরে এলুম।

পোড়ো বাড়ী

বাড়ীওয়ালা বললে, 'হাঁ মশাই, দাঙ্গার পর থেকেই আমার এই বাড়ীখানা খালি পড়ে আছে। এ অঞ্চলে আর কোন হাঙ্গামা নেই, অথচ এমন চমৎকার বাড়ী, তবু লোকে এখনো কেন যে এখানে বাস করতে ভয় পায়, তা আমি বুঝে উঠতে পারি না।'

আমি বললুম, 'বাড়ীখানা আমার পছন্দ হয়েছে। আমি মিথ্যা ভয় পাবার লোক নই; আর আমার কাছে বন্দুক আছে। কিন্তু আপনি কত ভাড়া চান?'

—'বেশী নয়, মাত্র পঞ্চাশ টাকা। এ বাড়ীর জন্যে আগে আমি একশো পঁচিশ টাকা ভাড়া পেতুম। কিন্তু একে এখন দিন-কাল খারাপ, তার উপরে বাড়ীখানার সুনাম আবার আমি ফিরিয়ে আনতে চাই। তাই আপাততঃ পঞ্চাশ টাকা ক'রে পেলেই আমি খুশি হব।'

আমি বললুম, 'তাই সই।'

লক্ষ্য করলুম, বাড়ীওয়ালা একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। ভাড়া কম হোক্, এই পোড়ো বাড়ীর জন্যে অবশেষে একজন ভাড়াটিয়া যে জুটল, এইটেই সে সৌভাগ্য ব'লে মনে করলে। লোকটার দেহ হাড়-জিরজিরে, আর কথা কইতে কইতে সে ক্রমাগত হাঁপাচ্ছিল—পুরাতন হাঁপানির রোগীর মত। কিন্তু তার চোখ দুটো এমন উজ্জ্বল যে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন জ্বলন্ত। আমার হাতে চাবির গোছা দিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে এবং লাঠি ঠক্-ঠক্ করতে করতে সে চ'লে গেল। বাঁচলুম,—কেন জানি না, তাকে দেখে আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল! যেন সে কোন ভাবী অমঙ্গলের অগ্রদূত।

দুই

এতদিন বিহারে ছিল আমার কর্মস্থল, এখন হঠাৎ বদলি হয়েছি কলকাতায়। পরিবারবর্গকে আপাততঃ বিহারে রেখেই, আমার বিহারী বেয়ারা রামসহায়কে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসেচি বাসা-বাড়ীর খোঁজে।

ভাড়া পেলুম মনের মত বাসা। 'ফ্লোর'-এর উপরে দিব্য দোতলা বাড়ী, নীচে চারখানা ও উপরে দু'খানা ঘর, তার উপরে আছে রান্না ও ভাঁড়ার ঘর। সংসারে মানুষ বলতে আমি, আমার স্ত্রী ও দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, সুতরাং এই বাড়ীতেই আমাদের বেশ কুলিয়ে যাবে।

গেল বারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এখানে নাকি চরমে উঠেছিল। এই বাড়ীতে যারা বাস করত, তাদের কেউ কেউ মারা পড়ে, কেউ কেউ পালিয়ে যায়; আজ পর্যন্ত আর ফিরে আসেনি। সেই থেকে বাড়ীখানা পোড়ো হয়ে আছে।

বাড়ীখানা শহরের উপকণ্ঠে। এর আশেপাশে ছিল কয়েকটা বস্তি, দাঙ্গার সময়ে মারামারি, লুঠতরাজ ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে সেগুলোর অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেতে বসেছে। আজও সেখানে বসতি নেই, দেখা যায় কেবল জনশূন্য ধ্বংসাবশেষ। তাই প্রায় আধ-পোয়া পথ পার না হ'লে এখানে কোন প্রতিবেশীর মুখ দেখবার উপায় নেই। কিন্তু সেজন্যে বিশেষ মাথা ঘামালুম না, কারণ আমি নিজে কুনো মানুষ, আমার পক্ষে প্রতিবেশীরা অনেক সময় বিরক্তিদায়ক।

ভৃত্য রামসহায় অনেক বিহারীর মত বেশ ভালো বাংলা বলতে পারত। আমি তাকে 'রাম' ব'লে ডাকি।

বললুম, 'রাম, আজকের মত তুমি বাড়ীর দোতলাটা সাফ ক'রে রাখো। আজই সন্ধ্যার আগে রাত কাটাবার জন্যে জিনিষপত্তর নিয়ে আমরা এই বাড়ীতে এসে উঠব।'

রাম বললে, 'যে আজ্ঞে হুজুর!'

ভাবতে লাগলুম, বাড়ীখানা আমি ভাড়া নিতে রাজী শুনে বাড়ীওয়ালার উজ্জ্বল চোখ দুটো অমন আরো বেশি জ্বল্-জ্বল্ ক'রে উঠল কেন? তা কি আনন্দে? না, তার অন্য কোন রহস্যময় কারণ আছে?

এ প্রশ্নের উত্তর পেলুম সেই রাত্রেই।

তিন

বলেছি, বাড়ীর দোতলায় মাত্র দু'খানা ঘর। একখানা পশ্চিম দিকে, আর একখানা দক্ষিণ দিকে। ঘর দু'খানা বেশ বড়সড়।

বাড়ীতে এসে যখন উঠলুম, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। স্থির করলুম, নিদ্রাদেবীর আরাধনার পক্ষে দক্ষিণের ঘরই প্রশস্ত।

নির্জন পল্লী, নিরালা সন্ধ্যা, নিস্তব্ধ বাড়ী। নিজেদের পদধ্বনি চারদিককে প্রতিধ্বনিত ক'রে তুলল—ঠিক যেন আরো কেউ কেউ পদচালনা করছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে! অনেক দিনের খাঁখাঁ-করা পোড়োবাড়ী, এরকম ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। এই মিথ্যা ভ্রমটা মনের ভেতর থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু পারলুম না,—বারবার তবু মনে হতে লাগল, এ বাড়ীতে আমরা ছাড়া আরো কাদের অস্তিত্ব আছে। এখনো তারা অদৃশ্য বটে, কিন্তু যে-কোন মুহূর্তে হ'তে পারে দৃশ্যমান!

এমন ধারণার কোন অর্থ হয় না। অমি ভীরু নই, ভূত

মানি না, ভূতের গল্প শুনেছি কিন্তু ভূত কখনও দেখিনি এবং দেখব বলে বিশ্বাসও করি না। হয়তো মনুষের মনের উপরে কাজ করে কোন কোন স্থান-কালের বিশেষত্ব। অসম্ভবকেও মনে হয় সম্ভবপর।

নির্বাচিত ঘরে ঢুকেই পড়লুম এক মুশকিলে। দক্ষিণ দিকের জানালা খুলে দিতেই মন উঠল শিউরে—পেলুম যেন কোন গলিত মৃতদেহের দুর্গন্ধ!

নাকে কাপড়চাপা দিয়ে উঁকি মারলুম জানালার বাইরে। নীচেই রয়েছে পচা জলে ভরা একটা খানা এবং তারপরেই খানিকটা জমির উপরে ভাঙাচোরা, লণ্ডভণ্ড, জনহীন বস্তি। কোথাও জন-প্রাণীর সাড়া নেই।

বললুম, 'রাম, ঐ খানার ধারে নিশ্চয় কোন মরা কুকুর-বেড়ালের পচা দেহ পড়ে আছে। এই দারুণ গ্রীষ্মে দক্ষিণের জানালা বন্ধ ক'রে তো এ ঘরে থাকা যাবে না। চল, পশ্চিম দিকের ঘরে যাই।'

রাম বললে, 'তাই চলুন।'

পশ্চিমের ঘরে হাওয়া কম হ'লেও দুর্গন্ধ নেই। কিন্তু অসুবিধায় পড়লুম আর এক কারণে। 'সুইচ' টেপাটেপি ক'রেও আলো জ্বালতে পারলুম না। ইলেকট্রিকের তার কোথাও খারাপ হয়ে গিয়েছে।

নাচার হয়ে রামকে বললুম, তুমি বাজার থেকে বাতি কিনে আনো। আজকের রাতটা তো কোন রকমে কাটিয়ে দি, তারপর কাল সকালে উঠে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।'

চার

বাতি নিবিয়ে, কেমন একটা অহেতুকী অশান্তির ভাব মনের মধ্যে নিয়ে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করলুম। শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়লুম বটে, কিন্তু তন্দ্রাঘোরেও মনে হয়েছিল, ঘরের ভেতরে কারা যেন নীরবে আনাগোনা করছে।

কতক্ষণ পরে জানি না, আমার ঘুম ভেঙে গেল আচমকা। আমার মুখের উপরে পড়ল যেন কার উত্তপ্ত নিশ্বাস!

আমি কি স্বপ্নলোকে বাস করছি? কিন্তু পর-মুহূর্তেই অনুভব করলুম, ঠিক পাশেই আমার গায়ের সঙ্গে গা মিলিয়ে শুয়ে আছে আর একটা জীবের দেহ! কোমল, রোমশ, জীবন্ত দেহ! স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ! সেই সঙ্গে পেলুম একটা জান্তব গন্ধ!

ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে একলাফে বিছানার বাইরে গিয়ে পড়লুম এবং পর-মুহূর্তে আচম্বিতে দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে উঠল ঘরের বৈদ্যুতিক আলো!

কিন্তু তখন আলো-জ্বালার ব্যাপারটা আমাকে বিস্মিত করলে না, কারণ সর্বপ্রথমেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল বিছানার দিকে।

কে ওখানে, কি ওখানে শুয়ে আছে? কিন্তু কি আশ্চর্য, বিছানার উপরে কেউ তো নেই!

কেবল বিছানার উপর নয়, আমার বিস্ফারিত চক্ষু সমস্ত ঘরখানা আতিপাতি ক'রে খুঁজে সন্দেহজনক বা ভয়াবহ কোন কিছুই আবিষ্কার করতে পারলে না!

এ কি ভ্রম? এ কি দুঃস্বপ্ন? কিন্তু তাই যদি হবে, তবে বারবার

'সুইচ' নাড়াচাড়া ক'রে বহু চেষ্টার পরেও যে আলো জ্বালতে পারিনি, সেটা হঠাৎ এখন আপনা-আপনি জ্ব'লে উঠল কেমন ক'রে ?

এগিয়ে 'সুইচ' তুলে দিলুম। কিন্তু চেষ্টা ক'রেও যে আলো জ্বালতে পারিনি, এখন চেষ্টা ক'রে তাকে আর নেবাতেও পারলুম না !

সবই অস্বাভাবিক ব্যাপার! তাড়াতাড়ি দরজা খুলে রামের নাম ধ'রে চীৎকার ক'রে ডাকতে লাগলুম। সে শুয়েছিল দরজার বাইরে বারান্দার উপরে। আমার চীৎকার শুনে ভিতরে ছুটে এল হন্তদন্তের মত।

উত্তেজিত স্বরে বললুম, 'রাম, এতক্ষণ আমার বিছানার উপরে কে শুয়ে ছিল! তারপর চেয়ে দেখ, ঘরের আলোটা আপনা-আপনি জ্বলে উঠেছে!'

আমার মুখের পানে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রামসহায় থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বোবা মূর্তির মত! সে বেশী ভয় পেয়েছে, না বেশী হতভম্ব হয়েছে, বোঝা গেল না।

আবার বিছানার দিকে চেয়েই আমার বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠল! ও আবার কি ব্যাপার ?

বিছানার চাদরের উপরে রয়েছে কতগুলো কাদামাখা পদচিহ্ন! দেখতে অনেকটা বিড়ালের থাবার মত, কিন্তু সেগুলি বিড়ালের থাবার চেয়ে অনেক বড়!

আমি চেঁচিয়ে ব'লে উঠলুম, 'হলপ্ ক'রে বলতে পারি, আধ মিনিট আগেও ঐ থাবার দাগগুলো ওখানে ছিল না!'

আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে রামসহায় বললে, 'হুজুর! বাইরে চলে আসুন!'

বাইরেই চলে এলুম—একেবারে বাড়ীর বাইরে। শেষ রাতটা কাটল রাস্তার ধারে রোয়াকের উপরে।

পাঁচ

সকালে বাড়ীওয়ালার সঙ্গে দেখা। সব কথা খুলে বললুম।

বাড়ীওয়ালা হাঁপের টান সামলাতে সামলাতে হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে, 'মিছেই ভয় পেয়েছেন। ঘরের ভিতরে ভাম এসেছিল। পাশের খানায় ভাম থাকে।'

—'কিন্তু সে বন্ধ ঘরের ভেতরে এল কেমন ক'রে?'

—'জানালা দিয়ে।'

—'ভাম কখনো একতলা থেকে দোতলায় লাফিয়ে উঠতে পারে?'

—'দোতলায় যখন উঠেছে, নিশ্চয়ই পারে।'

—'ধরলুম তাই। কিন্তু ভাম যখন ঘরের ভিতরে নেই, তখন তার পায়ের চিহ্ন বিছানার উপরে পড়ল কেন?'

—'আপনি ভুল দেখেছেন। পায়ের চিহ্ন আগে থাকতেই বিছানার উপরে ছিল।'

—'আর ইলেট্রিক লাইটের ব্যাপারটা?'

—'তারের ভিতর গলদ থাকলে অমন ব্যাপার মাঝে মাঝে হয়। আপনি পাখা চলে, আপনি আলো জ্বলে। মশাই, আজই আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি, আপনার কোন ভাবনা নেই।'

দেখছি, বাড়ীওয়ালার ওজরের অভাব নেই। শুক্‌নো হাসি হেসে বললুম, 'না, আমার আর কোন ভাবনাই নেই। কারণ, আজকেই আমি অন্য বাড়ীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ব।'

ভৌতিক, না ভেলকি?

হ্যাঁ, আফ্রিকায় অনেক বিচিত্র ঘটনাই ঘটে।

তখন আমি ছিলুম কঙ্গো প্রদেশে। যেখানে গ্রিবিঙ্গুই ও চারি নদী পরস্পরের সঙ্গে মিলেছে, সেখানে পেয়েছিলুম একখানা খালি বাড়ী। সাধারণ বাড়ী, তার উপরে ঘাসে-ছাওয়া চাল এবং তার চারদিক বেষ্টন ক'রে বারান্দা।

প্রথম দিনে আমার মালপত্তর বারান্দাতেই তোলা হল। পাহারা দেবার জন্যে রাত্রে সেখানে রইল দু'জন বেয়ারা।

রাত ন'টা বাজতেই নৈশ-ভোজনের পর শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নিলুম এবং ঘুমিয়ে পড়তে বিলম্ব হ'ল না। কিন্তু খানিক পরেই ঘুম গেল ভেঙে এবং শুনতে পেলুম, বাইরে থেকে বন্ধ দরজার উপরে আঁচড়াআঁচড়ির শব্দ হচ্ছে।

চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কে?"

কারুর সাড়া নেই, কিন্তু শব্দটা গেল থেমে। ভাবলুম, কোন জন্তু-জানোয়ার হবে। আর মাথা না ঘামিয়ে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলুম।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আবার সেই আঁচড়াআঁচড়ির শব্দ।

আবার শুধালুম, "কে?" কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে, উঠে আলো জ্বেলে ঘরের দরজা খুললুম।

কেউ কোথাও নেই। বারান্দায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছে কেবল আমার দুজন বেয়ারা। কিছুই বুঝতে না পেরে দরজা বন্ধ করে আলো না নিবিয়েই গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

কিন্তু মিনিট কয় যেতে-না-যেতেই ফের শুরু হ'ল সেই

আঁচড়া-আচড়ি। এবারে ভারি রাগ হ'ল। লাফ মেরে বিছানা ছেড়ে গালাগালি দিতে দিতে খুলে ফেললুম ঘরের দরজা। সব ফাঁকা, রাত করছে খাঁ-খাঁ। চারদিকের বারান্দায় এক চক্কর ঘুরে এলুম দ্রুতপদে। বেয়ারারা তেমনি নিদ্রিত। নেই আর কোন জনপ্রাণী।

এবারে রীতিমত হতভম্বের মত ঘরের ভেতরে ফিরে এলুম। কেউ নেই, শব্দ করে কে? শুয়ে শুয়ে এই কথা ভাবছি, তারপরেই আবার কে দরজা আঁচড়াতে লাগল!

এবার বিছানা না ছেড়েই জ্বালাতন হয়ে চীৎকার ক'রে বললুম, "দূর হ, দূর হ! নইলে বন্দুকের গুলিতে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেব!"

শাসানির ফল ফলল। একটা কণ্ঠস্বর শুনলুম, "ও মিঃ স্মিথ! আপনি কি আমাকে ভুলে গিয়েছেন? মনে নেই ওবাংঘীতে আমি আপনাকে যে-সব দৃশ্য দেখিয়েছিলুম?"

সিয়েরা লিয়নের একজন কালা আদমির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, মনে হ'ল তারই কণ্ঠস্বর। স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস, সে হচ্ছে 'জুজু'-মানুষ, অলৌকিক যাদু জানে।

আমি বললুম, "হ্যা, মনে পড়েছে। কিন্তু কোথায় তুমি? বাইরে গিয়েও আমি তো কারুকে দেখতে পাইনি?"

উত্তর হ'ল, "হ'তে পারে, কিন্তু আমি এইখানেই আছি। আচ্ছা, একটু সবুর করুন, আমি আপনাকে আরো কিছু দেখাব!

বিছানা থেকে নেমে চেয়ারের উপর ব'সে আমি আরো কিছু দেখবার অপেক্ষায় রইলুম।

এখানে এ ঘরের ভিতর থেকে আর একটা ঘরে যাওয়া যায়, মাঝে আছে একটা দরজা।

সেই দিকে তাকিয়ে দেখি—কি আশ্চর্য, দরজার মাথার উপরে রয়েছে একটা কালা আদমির মুখ !

অবাক হয়ে ভাবছি, কেমন ক'রে ঐ অসম্ভব জায়গায় তার আবির্ভাব হ'ল—হঠাৎ সে জিব বার ক'রে আমাকে ভেংচি কাটলে।

না, এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য করা অসম্ভব—আমি তেরিয়া হয়ে তার দিকে ছুটে গেলুম, সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল মুখখানা !

সেই দরজা খুলে ফেলে তার পিছনে দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রেও কারুর টিকি পর্যন্ত অবিষ্কার করতে পারলুম না। আবার দরজা বন্ধ ক'রে চেয়ারের উপরে এসে ব'সে পড়লুম দস্তুরমত ভ্যাবাচাকা খাওয়ার মত। কে হেসে উঠল আচম্বিতে! চোখ তুলে দেখি, দরজার টঙে আবার সেই কালা মুখ—আবার সে আমাকে ভেংচি কাটছে !

এবারে আমি আর চেয়ার ছেড়ে উঠলুম না, নাচারের মত বসে রইলুম চুপচাপ। একটু পরেই মুখখানা মিলিয়ে গেল।

কে বললে, "মেঝের দিকে তাকি দেখ।"

তাকিয়ে দেখলুম। মস্ত একটা সাপ সড়সড় ক'রে আমার চেয়ারের দিকেই এগিয়ে আসছে!

এতক্ষণে বেশ বুঝলুম, এ সব হচ্ছে আমার চোখের ভ্রান্তি। তবু সাপটা যখন চেয়ারের কাছে এসে পড়ল, আমি তাড়াতাড়ি পা দুটো উপরে তুলে না নিয়ে থাকতে পারলুম না।

পরদিন দুপুরে ডিস্ট্রীক্ট কমিশনার এবং শাসনকর্তার ওখানে ছিল আমার ভোজনের নিমন্ত্রণ। তাঁদের কাছে প্রকাশ করলুম গত রাত্রের কথা।

আমিও যা ভেবেছিলুম, তাঁরাও তাই বললেন। কেউ আমাকে নিয়ে মজা করছে।

তাঁরা আমার সঙ্গে এলেন আমার বাসাটা খানাতল্লাশ করবার জন্যে। কিন্তু সারা বাড়ী তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও কোথাও সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না।

শেষে স্থির হ'ল, আজ রাত্রে পাহারাওয়ালারা এই বাড়ীখানার চারদিক ঘিরে মোতায়েন থাকবে। এখান থেকে বিশ গজ দূরে আছে আর একখানা বাড়ী, সেখানে হাজির থাকবেন দুইজন শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারী। আজও রাত্রে আবার যদি সেই রকম শব্দ হয়, আমি যেন খুব চীৎকার ক'রে বলি—"কে ওখানে?" তৎক্ষণাৎ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা বেগে ছুটে আসবে এবং বাড়ীর চতুঃসীমার মধ্যে কারুকে দেখতে পেলেই পাহারাওয়ালারা বন্দুক থেকে করবে অগ্নিবর্ষণ।

আবার রাত এল। যথাসময়ে আমিও শয্যাগ্রহণ করলুম। কেটে গেল মিনিট পনরো। তারপরেই শুরু হ'ল দরজার উপরে সেই আঁচড়াআঁচড়ি।

চীৎকার ক'রে উঠলুম আমি উচ্চকণ্ঠে। দ্রুতপদে ছুটে এলেন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা, হাতে তাঁদের রিভলবার। পাহারাওয়ালারা চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল, কিন্তু কাকে ধরবে? কোথাও নেই জনমানব!

তারপরেও এক সপ্তাহকাল আমি সেই বাসায় বাস করেছিলুম। রোজ রাত্রেই ঘটত অমনি সব অলৌকিক ঘটনা।

কিন্তু আমি সে-সব আর আমলে আনতুম না। আহারের পর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে বলতুম, "আর নয়, এইবারে বিদায় হও। আমি এখন ঘুমুতে চাই।" সঙ্গে সঙ্গে আর কিছু শুনতে বা দেখতে পেতুম না।

আর একটা উল্লেখযোগ্য কথা। আমি আসবার আগে ওখানে কোন উৎপাত হয়নি। আমার পরে ও-বাড়ীতে বাসা বেঁধে ছিলেন একজন শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার। তখনও ঘটেনি কোন আজব ঘটনা।*

কিস্মৎ ?

ছোট ভাই সুরেশ শয্যাগত হয়ে পড়েছে। অসুখটা ব্লাড-প্রেসার। সুখেন্দুর সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়েছি। সে আমার বন্ধু ও বিখ্যাত ডাক্তার।

সুখেন্দুর দেখা পেলুম তার ডিসপেন্সারিতে। সে মন দিয়ে সুরেশের রোগের সব লক্ষণ শুনে বললে, "ভয়ের কারণ নেই। আজ ব্যবস্থাপত্র লিখে দিচ্ছি, কাল সকালে নিজে গিয়ে দেখে আসব রোগী কেমন আছে।"

সে কাগজ-কলম নিয়ে ব্যবস্থাপত্র লেখবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে এক অদ্ভুত মূর্তি।

আগন্তুক নারী। কিন্তু এমন তার চেহারা, দেখলেই শিউরে উঠতে হয়। প্রথমেই নজরে পড়ে তার দেহের শীর্ণতা ও দীর্ঘতা। সে এতো রোগা যে তার হাড় কয়খানা কেবল চামড়া দিয়ে ঢাকা আছে বললেই হয়। আর অধিকাংশ পুরুষের চেয়ে সে মাথায় উঁচু। তার বয়সও আন্দাজ করা সহজ নয়। ত্রিশও হ'তে পারে,

* [এটি একটি সত্য ঘটনা। প্রখ্যাত হস্তী-শিকারী ডবলিউ বাক্‌লে সাহেব তাঁর "Big Game Hunting in Central Africa" পুস্তকের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। স্মিথ নামে এক শিকারী বন্ধু তাঁর কাছে বলেছিলেন এই গল্পটি। আমরা স্মিথের মুখ থেকেই গল্পটি তুলে দিলুম।]

পঞ্চাশও। পায়ে জুতো আছে বটে, কিন্তু তার বেশভূষা আধুনিক নারীর মতো নয়।

তারপরেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার ভয়াবহ গায়ের রং। তা হচ্ছে একেবারেই মৃতদেহের মত—পাণ্ডুর এবং রক্তহীন। অন্তত: দুইদিনের বাসি মড়ার দেহের রং যেমনটি হয় এমনিধারাই। আমি দুইদিনের বাসি মড়া কখনো দেখিনি। তবু কেন জানি না, এই কথাই মনে হ'ল।

সুখেন্দুরও মুখে-চোখে ফুটে উঠল বিস্ময়ের ভাব।

নারী অতি ক্ষীণ ও অস্পষ্ট স্বরে বললে, "আমি ডাক্তার এস. বসুর কাছে এসেছি।"

সুখেন্দু বললে, "আমারই ঐ নাম। বসুন। আপনার কি কোন অসুখ করেছে?"

নারী বসল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"অসুখ কি?"

—"তাই জানবার জন্যেই তো আপনার কাছে এসেছি!" স্বর ক্ষীণ হ'লেও তার মধ্যে পাওয়া গেল যেন ব্যঙ্গের আভাস!

সুখেন্দু উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে একটা দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, "বেশ, আমার সঙ্গে আসুন।"

নারীও তার পিছনে পিছনে চলল এবং পাশের ঘরে প্রবেশ করবার আগে হঠাৎ আমার দিকে একটা দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে।

আমার বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল! আমি দেখলুম দুটো মাছের চোখ—সম্পূর্ণ ভাবহীন দুটো মরা মাছের চোখ!

খানিকক্ষণ পরে ডাক্তার ও রোগিণী দু'জনেই পাশের ঘর থেকে ফিরে এল।

সুখেন্দু টেবিলের ধারে ব'সে কলম হাতে নিয়ে শুধোলে, "আপনার নাম ?"

—"আমোদিনী দেবী।"

ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়ে সুখেন্দু বললে, "দুটো ওষুধ লিখে দিলুম, ব্যবহার ক'রে কেমন থাকেন জানাবেন।"

দর্শনীর টাকা টেবিলের উপরে রেখে, ব্যবস্থাপত্র নিয়ে রোগিণী দরজার দিকে অগ্রসর হ'ল, কিন্তু বাইরে যাবার আগে আর একবার হঠাৎ ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে গেল।

আবার দেখলুম, সম্পূর্ণ ভাবহীন সেই দুটো মরা মাছের মত চোখ!

মনের অস্বস্তি মনেই চেপে সুখেন্দুকে জিজ্ঞাসা করলুম, "ওর কি অসুখ হয়েছে ?"

—"অ্যানিমিয়া, বিষম অ্যানিমিয়া। ও বেঁচে আছে কেমন ক'রে বুঝতে পারলুম না।"

দুই

বাড়ীর দিকে ফিরছি।

গাড়ীর ভিতরে বসেই দেখতে পেলুম, রাস্তার ফুটপাথের উপরে দাঁড়িয়ে আমার বাড়ীর বৈঠকখানার জানলার দিকে তাকিয়ে আছে একটা নারীমূর্তি। যেমন রোগা, তেমনি ঢ্যাঙা তার চেহারা।

গাড়ীর শব্দে চমকে ফিরে চকিতে একবার চেয়ে দেখে মূর্তিটা হনহন ক'রে চ'লে গেল। তাকে দূর থেকে চিনতে পারলুম না বটে, কিন্তু কেন জানি না, আবার মনে পড়ল সুখেন্দুর ডিসপেন্সারির সেই অদ্ভুত রোগিণীর কথা।

আমার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে, আমার বাড়ীর বৈঠকখানার দিকে তাকিয়ে মূর্তিটা কি দেখবার চেষ্টা করছিল ?

গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীর ভিতরে ঢুকতেই সেটা বুঝতে দেরি লাগল না।

বৈঠকখানার ভিতরে বাড়ীর সব লোক এসে জড়ো হয়েছে। সকলেই হায় হায় করছে। নিশ্চয়ই ঘটেছে একটা কোন অঘটন।

ভিড় সরিয়ে ভিতরে ঢুকলুম। একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে চিত হয়ে প'ড়ে আছে আমার ছোটভাই সুরেশের চৈতন্যহীন দেহ। তার দুই হাত বিস্ফারিত, আড়ষ্ট চক্ষু নিবদ্ধ হয়ে আছে রাস্তার ধারের জানালার দিকে এবং তার মধ্যে ফুটে আছে এক প্রচণ্ড আতঙ্কের ভাব।

কিন্তু কেন ? জানালার ভিতর দিয়ে পথের উপরে কি বা কাকে দেখে সুরেশ এতটা ভয় পেয়েছিল ?

তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডেকে আনা হ'ল। তিনি সব দেখে-শুনে বললেন, "আর কোন আশা নেই। রোগীর হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে অত্যধিক রক্তের চাপে।"

তিন

মৃতদেহ নিয়ে এসেছি নিমতলার শ্মশান-ঘাটে।

দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠেছে চিতার আগুন। বড় নিষ্ঠুর ঐ চিতা। মানুষ যাদের ভালোবাসে তাদেরই গ্রাস করা তার ধর্ম।

সংসারে আপন বলতে ছিল কেবল আমার এই ভাইটি। সেও আমাকে ফেলে চ'লে গেল। দুনিয়ায় আজ আমি একা।

চিতার কাছে উবু হয়ে ব'সে গালে হাত দিয়ে এই সব কথা ভাবছি। আচম্বিতে মুখ তুলে আমার তুই চক্ষু হয়ে উঠল সচকিত।

খানিক তফাতে একদল কৌতূহলী লোকের মাঝখানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে এক সুদীর্ঘ, কঙ্কালসার নারীমূর্তি। সেই রোগিণী! মরা মাছের মত তুটো নিষ্পলক ড্যাবডেবে চোখে সে তাকিয়ে ছিল আমার দিকেই।

আমার সর্বাঙ্গের ভিতর দিয়ে খেলে গেল যেন উত্তপ্ত বিত্যুৎ-প্রবাহ!

কিন্তু এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠেই দেখি, সেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে সেই রহস্যময়ী নারীমূর্তি!

চার

কেটে গিয়েছে প্রায় এক বৎসর।

মানুষ একেবারে একলা থাকতে পারে না—একটি স্প্যানিয়েল কুকুর পুষেছি। সে আমার অষ্টপ্রহরের সঙ্গী—নাম তার রোভার। তাকে আমি ভালোবাসি, সে মানুষ হ'লেও তাকে আমি আরো বেশী ভালোবাসতে পারতুম না।

সেদিন বৈকালে গড়ের মাঠে বেড়াতে গিয়ে কার্জন পার্কের একখানা বেঞ্চির উপরে ব'সে বিশ্রাম করছিলুম।

রোভার আপন মনে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছিল ঘাস-জমির এখানে ওখানে। তারপর সে ছুটতে ছুটতে চ'লে গেল আমার পিছন দিককার একটা ঝোপের ওপাশে।

মিনিটখানেক পরেই সে ক্রুদ্ধস্বরে ঘেউ ঘেউ গর্জন ক'রে উঠল এবং পর মুহূর্তেই শুনলাম তার আর্ত চীৎকার।

তাড়াতাড়ি উঠে ঝোপের ওধারে ছুটে গেলুম।

প্রথমটা রোভারকে দেখতে পেলুম না। তার বদলে দেখলুম, একটা নারীমূর্তি মাটির উপরে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে কি যেন লক্ষ্য করছে।

আমার পদশব্দে চম্‌কে উঠে ফিরে দেখেই সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং হস্তদন্তের মত দ্রুতপদে চ'লে গেল সেখান থেকে। কিন্তু দেখবামাত্রই তাকে চিনলুম, সে সেই দীর্ঘ, কৃশ ও পাণ্ডু রোগিণী—দুই চোখ যার মরা মাছের মত বিস্ফারিত ও ভাবহীন।

সে যেখানে হুমড়ি খেয়ে ছিল, সেখানে আড়ষ্ট হয়ে মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে রোভারের দেহ। দৌড়ে গিয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে বুঝলুম, সে আর বেঁচে নেই! আমার বলবান, স্বাস্থ্যবান ও সুবৃহৎ কুকুর, আচম্বিতে মারা পড়ল কেমন ক'রে?

হঠাৎ খিল্ খিল্ ক'রে শুকনো হাসি শুনেই মুখ তুলে দেখি, খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে আছে সেই বীভৎস রোগিণী! ক্ষীণ অথচ খনখনে গলায় সে ব'লে উঠল—"আসব, আবার আমাদের দেখা হবে!"

নিদারুণ ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার সর্বাঙ্গ। দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে মারমুখো হয়ে আমি বেগে ছুটে গেলুম তার দিকে।

কিন্তু তাকে ধরতে পারলুম না। আশ্চর্য ক্ষিপ্রগতিতে সে চ'লে গেল আমার নাগালের বাইরে এবং তারপর হারিয়ে গেল চৌরঙ্গীর সচল জনতারণ্যে।

পাঁচ

কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। আজ তিন বৎসর ধ'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভারতের দেশে দেশে। সেই শরীরী অমঙ্গল এখনো আমাকে দেখা দেয় নি।

কিন্তু আমার মন বলে—এখনো সে আছে আমার পিছনে পিছনে, শেষবারের মত আবার তার চরম দেখা পাব যে-কোন দিন, যে-কোন মুহূর্তে!

সে কি আমার নিয়তি?

ভৌতিক চক্রান্ত

শিল্পী প্রমোদ রায়ের নাম অনেকেরই কাছে সুপরিচিত। আমি উদীয়মান চিত্রকর ও ভাস্কর প্রমোদ রায়ের কথা বলছি। ছবি আঁকায় এবং মূর্তি গড়ায় তার সমান খ্যাতি।

সে বাস করত নিমচাঁদ মল্লিক স্ট্রীটের একখানা ভাড়াবাড়ীতে। স্ত্রী ছাড়া তার পরিবারে আর কোন লোক নেই, বাড়ীখানা ছোট হ'লেও সে কোন অসুবিধা বোধ করত না। নীচের তলায় ছিল তার কারুকক্ষ বা 'স্টুডিয়ো'।

তার দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল দিব্য নির্ভাবনায়, কিন্তু হঠাৎ হলো এক মুশকিল। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত এক নোটিশ এসে হাজির, এ বাড়ী ছেড়ে তাকে উঠে যেতে হবে।

কলকাতায় তখন ভাড়াবাড়ীর একান্ত অভাব, পাড়ায় পাড়ায় উদ্বাস্তুদের ভিড়। মোটা টাকা সেলামী এবং ত্রিগুণ ও চতুর্গুণ ভাড়া দিতে চাইলেও খালি বাড়ী পাওয়া ভার হয়ে উঠেছিল। অধিকাংশ বাড়ীওয়ালাই পুরাতন ভাড়াটিয়া উঠে গেলে খুশি হয়, নূতন ভাড়াটিয়া বসিয়ে বেশী লাভ করবার লোভে।

প্রমোদ বাড়ীওয়ালার দাবি সহজে মানতে রাজী হ'ল না। াড়ীওয়ালা নালিশ করলে। মামলা হ'ল এবং মামলায় হেরে'গেল প্রমোদই। বাড়ী ছাড়বার জন্যে সে সময় পেলে মাত্র এক মাস।

দুই

ইতিমধ্যে ঘটতে লাগল অদ্ভুত সব কাণ্ড!

প্রমোদদের ঠিক পাশের বাড়ীতে থাকত নরহরি দাস, মফস্বলের লোক, কলকাতায় বাস করত ব্যবসাসূত্রে। মাঝখানে একটা পাঁচিল টপ্‌কালেই তাদের বাড়ীর ছাদ থেকে অনায়াসে প্রমোদদের বাড়ীর ছাদের উপরে এসে পড়া যেত।

নরহরির চেহারাখানি ছিল আদর্শ গদীওয়ালার মত—মোটা-সোটা, বেঁটেসেটে, কালোকোলো দেহ; চাঁদের মত গোলাকার মুখমণ্ডল; সাজগোজও তথৈবচ। সে পরম বৈষ্ণব, মাথায় চৈতনচুটকি, কপালে ও নাসিকায় তিলকমাটির চিহ্ন এবং কণ্ঠদেশে তিন সার তুলসীর মালা।

অথচ তার অত্যন্ত দহরম-মহরম ছিল মহা শক্তি ভৈরব ভট্টচাযের সঙ্গে। ভৈরবের চেহারা ছিল লম্বায়-চওড়ায় দশাসই, হাস্য ছিল অট্টহাস্যের মত এবং বাক্য ছিল হুঙ্কারের মত। তান্ত্রিক

ক্রিয়া ছিল তার পেশা এবং মদ্য আর মাংসই ছিল তার প্রধান পানীয় ও খাদ্য।

কিন্তু চেহারায় ও চরিত্রে আকাশ-পাতাল তফাত থাকলেও ভৈরব ও নরহরি দুজনেরই নেশা ছিল এক এবং সেটা হচ্ছে দাবাখেলা।

রোজ সন্ধ্যাবেলায় নরহরি তাম্বুল চর্বণ করতে করতে এবং ভৈরব তামাকু টানতে টানতে দাবাবোড়ের ছকের সামনে ব'সে খেলায় বিভোর হয়ে থাকত। সে সময়ে তাদের দেখলে লোকে বলাবলি করত, "এও যখন সম্ভবপর, তখন বাঘে আর গরুতে মিলনই বা অসম্ভব হবে কেন ?"

কিন্তু এমন মিলনেও বাগড়া পড়ল। আচম্বিতে মেনিন্‌জাইটিস্‌ রোগে নরহরি হ'ল গতাসু এবং সে-বাড়ী ছেড়ে দিয়ে দেশে চ'লে গেল তার পরিবারবর্গ। ভেঙে গেল সেখানকার দাবাবোড়ের সান্ধ্য আসর।

তিন

নরহরির মহাপ্রস্থানে ভৈরব ভট্‌চায্‌ দুঃখ পেল বটে, কিন্তু পরম আনন্দলাভ করল তার বাড়ীওয়ালা ক্ষেত্র বা ক্ষেতু মল্লিক।

নরহরি ভাড়া দিত মাসিক পঞ্চাশ টাকা। ক্ষেতু মল্লিক এখন জো পেয়ে দাবি ক'রে বসল এককালীন একহাজার টাকা সেলামী এবং মাসিক দেড় শ' টাকা ভাড়া। দিনকাল যা পড়েছে, তার দাবি নিশ্চয়ই অপূর্ণ থাকত না। এমন কি, হবু ভাড়াটিয়ারা আনাগোনাও শুরু ক'রে দিলে।

কিন্তু সহসা সঙ্ঘটিত হ'ল এক রোমাঞ্চকর ও অভূতপূর্ব ঘটনা।

এক পূর্ণিমার রাত্রে পথ দিয়ে চলতে চলতে নরহরিদের পরিত্যক্ত, তালাবন্ধ, খালিবাড়ীর বারান্দার দিকে তাকিয়ে বদন চাটুয্যে দেখলে এক বিসদৃশ দৃশ্য!

বারান্দার একপাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে মুখ ছাড়া সর্বাঙ্গ সাদা কাপড়ে ঢেকে এক সন্দেহজনক মূর্তি!

বদন চেঁচিয়ে বললে, "কে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?"

কোন সাড়া নেই।

বদনের সঙ্গে ছিল টর্চ, সে টপ ক'রে টর্চের চাবি টিপে আলো জ্বেলে যা দেখলে, তা সম্ভবপরও নয়, যুক্তিসঙ্গতও নয়।

সে মূর্তি হচ্ছে নরহরি দাসের!

তার পেটের পিলে চম্‌কে গেলেও, নিজের চোখের ভ্রম ভেবে বদন চাটুয্যে আরো ভালো করে দেখবার চেষ্টা করলে। উঁহু, মোটেই চোখের ভ্রম নয়, ও মুখ অবিকল নরহরি দাসের। ভয়ে সাদা হয়ে গেল বদনের বদন, ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে "অঁা" ব'লে পাড়া-কাঁপানো চীৎকার ক'রে সে ঘণ্টায় বিশ মাইল বেগে দৌড় মারলে নিজের বাড়ীর দিকে।

চার

বলা বাহুল্য, খবরটা ঘরে ঘরে র'টে যেতে দেরি লাগল না।

ক্ষেতু মল্লিক তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠে বললে, "বদ্‌না ব্যাটা ভাংচি দিতে চায়! নরহরি ছিলেন পরম বৈষ্ণব মানুষ; তিনি এখন গোলকধামে ব'সে মনের সুখে বিশ্রাম করছেন, কোন্ দুঃখে আবার এই ছাই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন?"

কিন্তু নরহরি যে এখনো সশরীরে বিরাজ করছে তার ঐ ভাড়াবাড়ীতেই, পাড়ার আরো কেউ কেউ তার অকাট্য চাক্ষুষ প্রমাণ পেলে। তবে দিনের বেলায় তাকে দেখা যায় না এবং দিনের বেলায় তাকে দেখবার আশাও কেউ করে না।

ফলে দাঁড়াল এই : প্রথমতঃ, নরহরির বাড়ীর সুমুখ দিয়ে লোকে রাত্রে পথ-চলাই ছেড়ে দিলে ; দ্বিতীয়তঃ, হবু-ভাড়াটিয়ারা ক্ষেতু মল্লিককে একেবারেই বয়কট করলে। বিনা ভাড়াতেও নরহরির বাড়ীতে বাস করবার মত লোকও আর পাওয়া যাবে ব'লে মনে হয় না।

অবস্থা যখন এই রকম, ঠিক সেই সময়ে তান্ত্রিক ভট্‌চায্‌ এসে বাসনা প্রকাশ করলে, "ক্ষেতুবাবু, নরহরিদের বাড়ীখানা আমি ভাড়া নিতে চাই!"

নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে না পেরে ক্ষেতু মল্লিক বললে, "তাই নাকি?"

—"হ্যাঁ ক্ষেতুবাবু! আমি হচ্ছি তন্ত্রসিদ্ধ মানুষ, বৈষ্ণবের প্রেতাত্মা আমাকে দেখলেই ভয়ে পিট্‌টান দেবার পথ পাবে না!"

ক্ষেতু মল্লিক তাড়াতাড়ি বললে, "ঠিক বলেছ ভট্‌চায্‌! তোমার সঙ্গে আমিও একমত।"

—"কিন্তু আমি হচ্ছি গরীব মানুষ, মাসে ত্রিশ টাকার বেশি ভাড়া দেবার শক্তি আমার নেই।"

—"বেশ, তাই সই।"

পাঁচ

নরহরির বাড়ীতে এসে জাঁকিয়ে বসল ভৈরব ভট্‌চায্‌। সত্য-

সত্যই মনে মনে তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, বৈষ্ণবের প্রেতাত্মা কিছুতেই শাক্তের নিকটবর্তী হবার সাহস প্রকাশ করতে পারবে না।

এবং যখন প্রথম দুই রাত্রির মধ্যে নরহরির চৈতনচুটকি পর্যন্ত দেখা গেল না, ভৈরব তখন পাড়ার বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে তন্ত্রের অপূর্ব মহিমা সম্বন্ধে জোরগলায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগল।

তারপরই এল অমাবস্যার রাত্রি।

দোতলার একটি ঘরে পূজার উপকরণ নিয়ে আসনাসীন হ'ল ভৈরব ভট্‌চায্‌। নরহরির ভয়ে পথ নির্জন, কোথাও টুঁ শব্দটি পর্যন্ত শোনা যায় না। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত, ঘরের ভিতরে জ্বলছে একটা হারিকেন লণ্ঠনের টিম্‌টিমে আলো।

ভৈরব একমনে দুই চক্ষু বুজে মন্ত্র জপ করছিল।

আচম্‌কা একটা বিকৃত, অনুনাসিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ভৈঁরঁব, এঁকচাঁল দাঁবাঁ খেঁলবেঁ ভাঁয়াঁ ?'

ভয়ঙ্কর চম্‌কে গিয়ে ভৈরব চোখ খুলেই দেখে, ঘরের দরজার কাছে পা থেকে গলা পর্যন্ত ধবধবে সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং নরহরি ছাড়া আর কেউ নয়! ভৈরবই সব চেয়ে বেশী চিনত নরহরিকে, তার চোখের ভ্রম হবার জো নেই।

তারপর আর কিছু নয়, বিকট এক আর্তনাদ এবং ভৈরবের ভূমিতলে পতন ও মূর্ছা!

ছয়

ক্ষেতু মল্লিক হতাশভাবে স্থির করলে, ঐ ভূতুড়ে বাড়ীখানা ভেঙে ফেলে একেবারে নতুন বাড়ী তৈরি করবে।

কিন্তু হঠাৎ যখন শিল্পী প্রমোদ রায় এসে নরহরির বাড়ীখানা ভাড়া নিতে চাইলে, তখন ক্ষেতু মল্লিকের চেয়ে বিস্মিত লোক পৃথিবীতে আর কেউ ছিল না বোধ হয়।

প্রমোদ বললে, "কলকাতায় খালি বাড়ী দুর্লভ, অথচ বাড়ী-ওয়ালার হুকুমে আর এক হপ্তার মধ্যেই আমাকে উঠে যেতে হবে। সুতরাং আমার অবস্থা বুঝতেই পারছেন তো ?"

ক্ষেতু মল্লিক বললে, "বেশ বাবা, আমি বেশী ভাড়াও চাই না, তুমি মাসে পঁচিশটি ক'রে টাকা দিও।"

—"তাহ'লে এই পঁচিশ টাকা অগ্রিম নিয়ে তিন বছরের কড়ারে আমাকে চুক্তিপত্র লিখে দিন।"

—"আচ্ছা।"

সাত

পাশের বাড়ীতে উঠে যাবার জন্যে প্রমোদ নিজের 'স্টুডিয়ো'র ছবি ও প্রতিমূর্তিগুলোকে স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা করছে, এমন সময়ে তার স্ত্রী নমিতা এসে ভয়ে ভয়ে বললে, "ওগো, নরহরিবাবুর বাড়ীতে গিয়ে আমি থাকতে পারব না।"

—"কেন ?"

—"কেন, তা কি তুমি জানো না ?"

প্রমোদ হাসিমুখে নমিতার হাত ধ'রে ঘরের এককোণে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর একখানা সাদা চাদর একধারে সরিয়ে নিতেই দেখা গেল, একটা খড়ের কাঠামোর উপরে বসানো রয়েছে নরহরির রং-করা মাটি দিয়ে গড়া মুখমণ্ডল!

নমিতা হতভম্ব।

প্রমোদ বললে, "আমি হচ্ছি ভাস্কর, নরহরির মুখ আমি অনায়াসেই গড়তে পেরেছি। পাঁচিল টপকে পাশের বাড়ীতে যাওয়াও আমার পক্ষে কঠিন হয় নি ; আমাকে সাহায্য করেছে আবছা রাত, মানুষের স্বাভাবিক ভয় আর কুসংস্কার !

জঙ্গলের নাট্যাভিনয়

ভারতে সেই আমার শেষ ব্যাঘ্র-শিকারের চেষ্টা।

কিন্তু আমার হাতের বন্দুক হাতেই রইল, আমাকে হ'তে হ'ল এক বন্য-নাটকের নির্বাক ও নিশ্চল দর্শক। শিকার করতে পারলাম না বটে, কিন্তু সেদিনের আগ্নেয়-স্মৃতি চিরদিন থাকবে আমার মানসপটে।

সে অঞ্চলে একটা মস্ত বাঘ এসে বড়ই উৎপাত শুরু করেছিল। গত রাত্রেই সে বধ করেছিল একটা পোষমানা গ্রাম্য মহিষকে। তারপর খানিকটা খেয়ে মৃতদেহের বাকি অংশটা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল জঙ্গলের ভিতরে।

আজ সে নিশ্চয়ই বাকি দেহটার লোভে ঘটনাস্থলে পুনরাগমন করবে, এই আশায় আমি প্রস্তুত হয়ে ব'সে আছি মাচান বেঁধে এক গাছের উপরে।

বনের ভিতরে নেমে আসছে ছায়াময়ী সন্ধ্যা। দিনের জীবেরা বোবা হয়ে ঘুমুতে গিয়েছে যে যার বাসায়। হানা দিতে বেরিয়েছে কেবল নিশাচর হত্যাকারীর দল, এবং জেগে আছে কেবল রাতের

কীটপতঙ্গরা ; তাদের অশ্রান্ত কণ্ঠস্বরে সারা বনভূমি হয়ে উঠেছে বিচিত্র শব্দময়।

বন্য-জগতে সন্ধি নেই, শান্তি নেই, আছে কেবল যুদ্ধ আর হানাহানি। জীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে যুদ্ধের ক্ষান্তি নেই। সব চেয়ে বেশী যার যোগ্যতা ও চাতুর্য, সব চেয়ে বেশী দিন ধ'রে সেই-ই আত্মরক্ষা করতে পারে মৃত্যুর কবল থেকে।

আমি একলা। আমার সামনে রয়েছে খানিকটা খোলা জমি ও জলাভূমি। তারপরেই দেখা যায় নিবিড় জঙ্গলের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। জলার বাতাস ঠাণ্ডা ও মিষ্টি, তপনতাপিত মনকে মাতিয়ে তোলে। প্রকৃতির এই শয্যাগৃহের চিত্র দেখে চমৎকৃত হয় না, বোধ করি এমন মানুষ কেউ নেই।

আচমকা আমি সতর্ক হয়ে উঠলুম। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে শোনা যাচ্ছে কার পায়ের শব্দ! নলখাগড়ার বন দুলে উঠে দুমড়ে পড়ল এবং পরমুহূর্তেই দেখলুম একটা বিপুলবপু বন্য মহিষ সামনের খোলা জমির উপরে এসে দাঁড়াল! মাদী মহিষ, তার মাথার উপরে রয়েছে এমন প্রকাণ্ড দুটো শৃঙ্গ, যার জোড়া খুঁজে পাওয়া ভার। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যেন প্রচণ্ড শক্তির তরঙ্গ!

লোভনীয় শিকার! বন্দুক ছোঁড়বার জন্যে মনটা উসখুস ক'রে উঠল। কিন্তু আমি এখানে এসেছি বাঘ মারতে, অতএব বন্দুক ছোঁড়বার লোভ সংবরণ করতে বাধ্য হলুম। আজ খুশি হয়ে মনে করি, ভাগ্যে সেদিন বন্দুক ছুঁড়িনি।

তারপর মস্তবড় সেই বুনো মোষটা চারিদিকের আঘ্রাণ নিতে লাগল সন্দিগ্ধ ভাবে। একবার আকাশের দিকে মুখ তুলে চীৎকার ক'রে উঠল উচ্চকণ্ঠে। এমন বিষম সে চীৎকার, সারা বন যেন কাঁপতে লাগল।

দূরে—বহু দূরে বনের ভিতরে জেগে উঠল আর একটা মহিষের কণ্ঠধ্বনি, নিশ্চয়ই তার জোড়া। সে তখন সানন্দে মদ্দা মহিষটার ডাকে সাড়া দিলে এবং শিং নামিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল।

তারপর সে এদিকে-ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে ব্যাঘ্রের কবলে নিহত গ্রাম্য মহিষটার ভুক্তাবশিষ্ট দেহের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একমনে মিনিট দুই লাসটা শুঁকে দেখলে, তারপর আবার মাথা তুলে ক্রুদ্ধকণ্ঠে গর্জন ক'রে কাঁপিয়ে তুললে চারিদিক! সে গর্জন যেন বলতে চায়—যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি!

আচম্বিতে তার দেহে জাগল কেমন যেন অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব। চট্ ক'রে সে ফিরে দাঁড়াল এবং মাথা নীচু ক'রে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে জঙ্গলের একপ্রান্তে। সঙ্গে সঙ্গে আমারও চোখ গেল সেইদিকে এবং সে যা দেখেছে আমিও তা দেখতে পেলুম।

ঘাস-জমির উপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে চুপি চুপি এগিয়ে আসছে মস্ত একটা বাঘ! তারপরেই মহিষটাকে দেখতে পেয়ে থম্‌কে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, ছটফট করতে লাগল কেবল তার লাঙ্গুলটা!

চিরশত্রু বাঘকে সামনে দেখে মহিষ পদাঘাতে চারিদিকে ছড়িয়ে দিলে মাটির গুঁড়ো।

দুই প্রতিযোগীই সমান সতর্ক এবং পরস্পরের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে অত্যন্ত প্রস্তুত। উভয়েরই হিংস্র চক্ষে মারাত্মক ঘৃণার দৃষ্টি।

বাঘটাকে মারতে পারতুম, কিন্তু আমি মারব না। আমি আজ কেবল দেখতে চাই, গহন বনের এই বিস্ময়কর নাট্যাভিনয়ের কোন্‌খানে পড়বে শেষ যবনিকা!

ধীরে ধীরে ডোরাকাটা কেঁদো-বাঘটা তার নমনীয় দেহ নিয়ে তেমনি গুঁড়ি মেরেই এগিয়ে আসতে লাগল। তার স্থির জ্বলন্ত

দৃষ্টি মহিষের দিকেই নিবদ্ধ এবং বারংবার মাটির উপরে ছিপটির মন আছড়ে পড়তে লাগল তার ক্রুদ্ধ লাঙ্গুলটা। তার প্রচণ্ড চোয়াল বেয়ে ঝ'রে পড়ছে লালার ধারা।

মহিষ কিন্তু এগুলোও না, পিছুলোও না—কেবল নিজের মুখ রাখলে বাঘের মুখের দিকে। বিপদজনক তার ভাবভঙ্গী।

মহিষের চারদিকে বাঘটা ঘুরতে লাগল চক্রের পর চক্র দিয়ে।···ক্রমে ক্ষুদ্রতর হয়ে এল চক্রের আয়তন। বাঘের ইচ্ছা, পিছন থেকে লাফ মেরে মহিষের পিঠের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে: মহিষ কিন্তু তারও চেয়ে তৎপর, তাকে দিলে না সে সুযোগ। চমৎকার তার পাঁয়তারা, জঙ্গলের কোন প্যাঁচই তার অজানা নেই।

আচম্বিতে বাঘটা দাঁড়িয়ে প'ড়ে ল্যাজ আছড়াতে আছড়াতে বলের মত গোল ক'রে ফেললে নিজের দেহকে, মুখে সে কোন শব্দই করলে না, কিন্তু তার দেহটা বাতাস কেটে এগিয়ে এল রকেটের মত! ঠিক সেই মুহূর্তেই ভীষণ চীৎকার ও দুই শৃঙ্গ উদ্যত করে মহিষও করলে প্রতি-আক্রমণ, শূন্য-পথেই হ'ল দু'জনের সঙ্গে দু'জনের ঠোকাঠুকি এবং একসঙ্গে দু'জনেই হ'ল পপাতধরণী-তলে। কিন্তু চোখের পলক পড়বার আগেই দু'জনেই আবার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর একসঙ্গে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আবার করলে পরস্পরকে আক্রমণ।

এবারে ফাঁক পেয়ে বাঘটা লাফ মেরে মহিষের পিঠের পিছন দিকে গিয়ে পড়ল। কিন্তু কামড় খাবার আগেই বাঘকে পিঠের উপরে নিয়েই মহিষ শূন্যে লম্ফত্যাগ ক'রে চিত হয়ে উল্টে পড়ল ভূমিতলে। তার এই সুন্দর কৌশলটি ফলপ্রদ হ'ল তৎক্ষণাৎ।

পাছে মহিষের গুরুভার-দেহের তলায় হাড়গোড় ভেঙে থেঁতলে মরতে হয়, সেই ভয়ে বাঘ তাড়াতাড়ি তাকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে

উঠল, এবং আবার লাফ মেরে শত্রুর ডানস্কন্ধ কামড়ে ধরলে। মহিষ এক ঝটকান মেরে বাঘটাকে আবার মাটির উপরে গেড়ে ফেললে ক্রুদ্ধ গর্জন করতে করতে। তারপর শিং দিয়ে শত্রুকে উল্টে ফেলে প্রকাণ্ড একটা পাকুড় গাছের মোটা গুঁড়ির উপর চেপে ধরলে প্রাণপণে।

মহিষের গর্জনমুখর মুখ থেকে তখন হু হু ক'রে রক্ত ঝ'রে পড়ছে এবং তার ক্ষতবিক্ষত কণ্ঠ, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশ থেকেও রক্তধারা ঝরছে দরদর ধারে। সে কয় পা পিছিয়ে এসেই আবার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুকে একেবারে সাবাড় ক'রে ফেলবার জন্যে।

কিন্তু বাঘটা অত্যন্ত আহত হলেও তার লড়বার শক্তি তখনও ফুরিয়ে যায়নি। সেও যে-সে যোদ্ধা নয়। আবার সে করলে লম্ফত্যাগ, এবং এবারে অবতীর্ণ হ'ল মহিষের দুই শৃঙ্গের ঠিক মাঝখানে। তার ডোরাকাটা রঙিন দেহের উপরার্ধ-ভাগ এমনভাবে ঝুলে পড়ল যে, সম্পূর্ণরূপে ঢেকে গেল মহিষের মুখমণ্ডল। তার দাঁত ও নখ গভীরভাবে ব'সে গেল মহিষের মাংসের ভিতরে এবং তার দুই কষ থেকেও শত্রুর গা বেয়ে বেরুতে লাগল টকটকে রক্তস্রোত।

মহা যন্ত্রণায় মহিষ চেঁচিয়ে উঠল উচ্চৈঃস্বরে। একটা গাছের গুঁড়ির দিকে দৌড়ে গেল প্রবল বেগে—তার পিঠের বোঝা তখনও তার মুখের উপরে হুমড়ি খেয়ে আছে। তারপরেই কানে এল একটা ঢপাৎ ক'রে শব্দ! শত্রুকে পিঠের উপর থেকে ঝেড়ে ফেলে মহিষ একবার ব'সে পড়েই টপ্‌ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠল।

ব্যাঘ্রের কণ্ঠ ভেদ ক'রে নির্গত হ'ল ক্ষীণ একটা গর্জন। বুঝলুম তার অবস্থা রীতিমত কাহিল। একেবারে অবশ হয়ে সে ভেঙ্গে প'ড়ে হাঁপাতে লাগল।

মহিষ কিন্তু শত্রুর শেষ রাখতে রাজী নয়। সে একটু পিছিয়ে এসে ভালো ক'রে নিজের লক্ষ্য স্থির করলে। তারপর বেগে ছুটে গিয়ে নিষ্ঠুর ও তীক্ষ্ণাগ্র শৃঙ্গ দিয়ে বাঘকে গুঁতোতে লাগল বারংবার। বাঘ আত্মরক্ষা করবার জন্যে ঝোপের আড়ালে স'রে যাবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু সে সুযোগ পেলে না।

এ মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতা নয়। কারণ, সেক্ষেত্রে মধ্যস্থ এতক্ষণে প্রতিযোগিতা বন্ধ ক'রে দিতেন, কেননা বাঘটা যে নিশ্চিত-রূপেই হেরে গিয়েছে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ-ই নেই। কিন্তু জঙ্গলে মধ্যস্থ কোথায়? লড়াই থামাবে কে? এখানকার আইন-কানুনে নেই দয়ামায়ার ঠাঁই। এখানে লড়াই থামতে পারে কেবল একপক্ষেরই মৃত্যুর পর।

বিজয়ী বীরের মত মহিষ পূর্ণকণ্ঠে এমন গর্জন ক'রে উঠল যে, আমার মাচান পর্যন্ত থর্ থর করতে লাগল। এইবারে করলে সে শেষ আক্রমণ। ব্যাঘ্রের ক্ষতবিক্ষত, হাড়গোড়ভাঙা দেহটা সে শিঙে ক'রে আবার শূন্যে তুলে নিলে, তারপর মাথার এক ঝাঁকুনি মেরে দেহটাকে খানিক তফাতে ছুঁড়ে ফেলে দিলে একটুকরো খড়ের মত অনায়াসেই। মহিষ এগিয়ে শত্রুর দেহটা আর পরীক্ষা পর্যন্ত করলে না। তার যে মৃত্যু হয়েছে, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত।

মনে হ'ল, ধন্য ধন্য ব'লে চেঁচিয়ে উঠে বিজেতাকে অভিনন্দন দি! বলা বাহুল্য, শিকার আমাকে বঞ্চিত করলেও আমার সহানুভূতি ছিল মহিষের দিকেই। আজ যে অভাবিত দৃশ্য দেখবার সুযোগ পেলুম, তার কাছে তুচ্ছ যে-কোন শিকার। মানুষের জীবনে এমন সুযোগ দুর্লভ।

চারদিকে ঘন হয়ে আসছে রাত্রের কালো ছাউনি। শিশু-চাঁদ উঠছে বনের মাথায়। নীলাকাশে তারারা করছে টিপ্ টিপ্ টিপ্।

মহিষের কণ্ঠে ফুটল আবার বিজয়গর্জন। এবারে ঘন বনের কাছ থেকেই শোনা গেল মদ্দা মহিষের গলা। তখনই হুড়মুড় ক'রে সশব্দে জঙ্গল ভেঙে মাদী মহিষটা ছুটে গেল তার সাথীর সন্ধানে। জঙ্গলের নাট্যলীলার উপরে পড়ল যবনিকা।

বাঘের দেহটা সেইখানেই ফেলে চ'লে এলুম। ও দেহ আমার প্রাপ্য নয়। *

বংশীবদনের বহির্গমন

যাকে বলে দশাসই পুরুষ।

মাথায় লম্বা সাড়ে ছয় ফুট, ছাতির মাপ পঞ্চাশ ইঞ্চি পেশীগুলো যেন লোহার মত শক্ত।

সবাই বললে, হ্যাঁ, একখানা চেহারা বটে!

মুখশ্রী ভালো নয় এবং গায়ের রংটাও এমন মিশমিশে কালো যে তার সঙ্গে কষ্টিপাথরের গড়া মূর্তির তুলনা করলে অত্যুক্তি করা হবে না।

তবু সুপুরুষ না হ'লেও এমন পুরুষোচিত সুগঠন নজরে পড়ে কদাচিৎ। বয়স হবে বিশ কি একুশ। নাম বংশীবদন। নামকরণটা হয়েছিল বোধ করি রঙের জন্যই, কারণ বাঁশীবদন বলে কেষ্টঠাকুরকেই।

---

* [মেজর আর. ফোরান পৃথিবীর দেশে দেশে শিকার ক'রে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর লিখিত শিকার-কাহিনীও যথেষ্ট বিখ্যাত। নীচের কাহিনীটির বক্তা হচ্ছেন তিনি নিজেই।]

আমাদের পাড়ায় এসে বাসা ভাড়া নিয়েই সে দস্তুরমত আসর জমিয়ে তুলতে দেরি করলে না।

শোনা গেল, বংশীবদন বংশীবাদন ভালোবাসে না, রোজ মুগুর ভাঁজে, ডন-বৈঠক দেয়, কুস্তি লড়ে। পাড়ায় এসেই বশ ক'রে ফেললে সেই সব অখদ্যে ও অভব্য ছোঁড়াকে, রাস্তার রোয়াকে দিন-রাত আড্ডা না দিলে যাদের পেটের ভাত হজম হয় না। তার মুখসাবাসি শুনে ও ধরনধারণ দেখে ডানপিটেরাও তাকে সমীহ ক'রে চলতে লাগল।

এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামালে না, কারণ কোন্ পাড়াতেই বা এমনি লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়ার দল ও তাদের পালের গোদা নেই? কিন্তু ক্রমেই শুরু হ'ল হরেক রকম উৎপাত।

দুই

সবচেয়ে বিষম উপদ্রব হচ্ছে, চাঁদার উপদ্রব।

বংশীবদন মতপ্রকাশ করলে, বছরে আমরা তিনবার সর্বজনীন পূজা করব—দুর্গাপূজোর সময়, কালীপূজোর সময়, আর সরস্বতী পূজোর সময়। দুর্গাপূজোর আর মাসদেড়েক বাকি। সবাই বাড়ী বাড়ী ঘুরে চাঁদা আদায়ে লেগে যাও। গরিবরা যে যা পারে দেবে, কিন্তু বড়লোকদের কাছ থেকে পঁচিশ টাকার কম নিবি না।

পাড়ায় সম্পন্ন গৃহস্থ ছিল পঁচিশ ঘর। তাদের মধ্যে মাত্র একজন দিলে পঁচিশ টাকা। কেউ কেউ আট আনা, একটাকা বা দু' টাকা পর্যন্ত দিতে চাইলে, কেউ কেউ কিছুই দিলে না।

যারা কম চাঁদা দিতে চাইলে বা কিছুই দিলে না, তাদের

বাড়ীতে আরম্ভ হ'ল সব বিপরীত কাণ্ড। কোথাও বোমা পড়ে, কোথাও হয় ইষ্টক বা বিষ্ঠা বৃষ্টি।

থানায় খবর গেল। কিন্তু পুলিস এসে কোনই সুরাহা করতে পারলে না। পুলিস বংশীবদন ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের সন্দেহ করলে বটে, কিন্তু তাদের গ্রেপ্তার করবার মত প্রমাণ পেলে না।

বিষ্ঠা, ইষ্টক ও বোমার কবল থেকে নিস্তার পাবার জন্যে সবাই যেচে এসে চাঁদা দিয়ে গেল।

প্রফেসর সুরেন চৌধুরীর বাড়ীর বড় রোয়াকটাই বংশীবদন বেশী পছন্দ করত। সদলবলে সেইখানে ব'সেই সে বাক্য-বন্দুকে বধ করত রাজা-উজীরকে।

সুরেনবাবু প্রফেসর মানুষ, নিচের ঘরে ব'সে পড়াশোনা করতেন। আড্ডাধারীদের হুল্লোড়ে তিনি অতিশয় অতিষ্ঠ হয়ে একদিন বাইরে এসে বললেন, "তোমরা, এখনি আমার রক ছেড়ে চ'লে যাও।"

বংশীবদন উঠে দাঁড়িয়ে বুক ও হাতের গুলি ফুলিয়ে বললে, "যদি না যাই?"

—"থানায় ফোন করব।"

—"মাইরি নাকি প্রফেসর? আচ্ছা, সেলাম।" সে দলবল নিয়ে প্রস্থান করলে।

চারদিন পরে এক সন্ধ্যাবেলায় সুরেনবাবু সদরদরজা থেকে বাড়ীর ভিতরে পা বাড়িয়েই হলেন পপাত ধরণীতলে; তাঁর মাথা গেল ফেটে।

দরজার সামনে ছড়ানো ছিল আট-দশটা কলার খোসা।

হপ্তাখানেক পরে দেখা গেল, সুরেনবাবুর পড়বার ঘরে এখানে-ওখানে কিলবিল করছে পনরো-ষোলোটা সাপের বাচ্চা।

ব্যাপারটা আরো বেশী দূর গড়াবার আগেই সুরেনবাবু সে বাড়ী ছেড়ে উঠে গেলেন। বংশীবদন ছোঁড়ার পাল নিয়ে আবার হাসতে হাসতে এসে রোয়াক অধিকার করলে।

পাড়ার লোক ভয়ে বোবা।

তিন

নামে এবং দেহে ভোঁদা হ'লেও বুদ্ধি তার মোটা ছিল না।

ভোঁদাই ছিল এতদিন এ পাড়ার মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো ছোঁড়াগুলোর পালের গোদা। তার পসার মাটি হয়ে গিয়েছে শ্রীমান বংশীবদনের আবির্ভাবে। এখন আর কেউ তাকে মানে না। এজন্যে সর্বদাই সে মনমরা হয়ে থাকে। গলার জোরে এবং গায়ের জোরে বংশীবদনের কাছে সে নগণ্য।

সেদিন সকালে দালানে ব'সে ভোঁদা পাঁপর ভাজা খেতে খেতে চা পান করছে এবং দাসী বাটনা বাটতে বাটতে তার মায়ের সঙ্গে কথা কইছে। ঠিকে ঝি, আরো দু'বাড়ীতে কাজ করে।

মা বলছিলেন, "হ্যাঁরে, ভালোর মা, তুই তো বংশীদেরও বাড়ীতে কাজ করিস। অমন দজ্জাল ছেলেকে বাড়ীর লোক শাসন করতে পারে না?"

ভালোর মা দুই চোখ কপালে তুলে বললে, "কে দাদাবাবুকে শাসন করবে গো? সে একটা খুনে ডাকাত, সবাই তার ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকে।"

মা বললেন, "ওমা, এমন কথাও কখনো শুনি নি।"

ভালোর মা বললে, "দাদাবা জব্দ কেবল রাতের বেলায়।

অমন যে দত্যির মত গতর, অন্ধকারে গেলেই কেঁপে সারা। সঙ্গে আর কেউ না শুলে ভয়ে ঘুমোতেই পারে না।"

মা সবিস্ময়ে শুধোন, "কেন রে!"

—"ভূতের ভয় মা, ভূতের ভয়। রাতে কেউ ভূতের নাম করলেও দাদাবাবু আঁতকে ওঠে। যেন যত রাজ্যের ভূত-পেত্নী তারই ঘাড় মটকাবার জন্যে ওত পেতে আছে।"

ঝি হাসতে লাগল, মা হাসতে লাগলেন, ভোঁদাও হেসে খুন।

চার

বংশীবদনদের বাসা বড় রাস্তার পাশে একটা গলির ভিতরে।

একদিন একটা কাবুলীওয়ালা সেই গলির ভিতরে ঢুকল, নিশ্চয় কারুর কাছে তার টাকা পাওনা ছিল।

কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই সে বংশীবদনের বাড়ীর সামনে টলে ধপাস্ ক'রে প'ড়ে গেল। একেবারে আড়ষ্ট!

সবাই চারদিক থেকে ছুটে এসে দেখলে, কাবুলীর দেহে আর প্রাণ নেই। বোধ হয় তার হৃদ্‌রোগ ছিল। পুলিস এসে লাশ তুলে নিয়ে গেল।

বংশীবদন মুখ ভার ক'রে শুক্‌নো গলায় বললে, "কাবুলীটা কি নচ্ছার হে! দুনিয়ায় এত ঠাঁই থাকতে ব্যাটা কিনা পটল তুললে আমাদের বাসার সামনে এসেই!" তাকে তখন দেখাচ্ছিল খানিকটা গ্যাস-বেরিয়ে-যাওয়া বেলুনের মত।

দিন তিন-চার পরেই পাড়ায় খবর র'টে গেল, একজন কাবুলী সন্ধ্যা হ'লেই খট্ খট্ শব্দ তুলে গলির ভিতরে পায়চারি করে

এবং দুই চোখে তার দুটো আগুন জ্বলে! নিশ্চয় সে খাবি খেয়েও দেনাদারকে ভোলে নি, নিজের পাওনা টাকা ছাড়ে না কাবাজ।

কাবুলীটাকে প্রথম কে দেখেছিল তা জানা গেল না বটে, কিন্তু দূর থেকে আরও কেউ কেউ তাকে দেখতে পেলে : প্রত্যেকেই বলে এক কথা—পায়ের জুতোয় খট্ খট্ শব্দ হয় এবং চোখে জ্বলে দুটো আগুন!

সন্ধ্যা নামলেই গলি একেবারে ফাকা—জনপ্রাণী বাড়ীর বাইরে পা বাড়ায় না এবং সন্ধ্যা হবার আগেই বংশীবদনও সুড়সুড় ক'রে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে সদর দরজা বন্ধ ক'রে দেয়।

দলপতির অভাবে রোয়াকের আড্ডা মাটি হয় বুঝি।

পাঁচ

বংশীবদনদের বাড়ীখানা একতালা। সদর দরজার পাশেই তার ঘর।

সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই সে গলির দিকের জানালাগুলোর খড়খড়ি বন্ধ ক'রে দিলে। তার অবস্থা হয়েছে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত। এখন থেকে কাল সকাল পর্যন্ত তাকে ঘরের ভিতরেই বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

উপায় কি? সময় কাটাবার জন্যে সে সাহিত্যচর্চা করতে বাধ্য হ'ল—অর্থাৎ একখানা বই নিয়ে পড়তে বসল। গোয়েন্দাকাহিনী—নাম "কন্ধকাটার হত্যাকাণ্ড"। দম বন্ধ ক'রে পড়বার মত বই।

কোথা দিয়ে কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কাবুলী ভূতের কথাও ভুলে যেতে হয়।

আচম্বিতে শব্দ শোনা গেল।—খট্‌খট্, খটাখট্!

বংশীবদনের বুক ধড়াস ক'রে ওঠে, সর্বাঙ্গে জাগে রোমাঞ্চ! বই ফেলে সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় ক'রে ভাবে, শব্দ বললেই তো ভূত বোঝায় না, ব্যাপারটা কোন ধাপ্পাবাজের চক্রান্ত নয় তো?

যা থাকে কপালে! চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করবার জন্যে সে রুদ্ধশ্বাসে কম্পিত হস্তে খড়খড়ির একটা পাখি নিঃশব্দে একটুখানি খুলে গলির মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে।

ওরে বাবা রে! পরমুহূর্তে বিকট চীৎকারে পাড়া কাঁপিয়ে মাটির উপরে লম্বমান হ'ল বংশীবদন।

বাড়ীর লোকজন হাঁ হাঁ করে ছুটে এল। হ'ল কিরে, হ'ল কি?

—"কাবুলী ভূত! কাবুলী ভূত! চোখ দুটো দপ্‌ দপ্‌ ক'রে জ্বল্‌ছে!"

ছয়

কাবুলী ভূতের বিপদজনক সান্নিধ্য পরিত্যাগ ক'রে পরদিনেই বংশীবদনরা সে-পাড়া ছেড়ে সরে পড়ল। ভূতটা আজ যেন পথে পায়চারি করে, কাল যদি তার বাড়ীর ভিতরে বেড়াবার শখ হয়, তখন তাকে ঠেকিয়ে রাখবে কে?

ভোঁদার মুখে হাসি ধরে না। আবার রোয়াকে গিয়ে সে দখল করলে দলপতির গদি।

কিন্তু সকলের মনে একটা সন্দেহ থেকে গেল। বংশীবদনের পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে কাবুলী ভূতটাও অদৃশ্য হ'ল কেন?

এ গুপ্ত কথাটা ভোঁদা কেবল আমার কাছে প্রকাশ করেছে চুপিচুপি।

থিয়েটারের বেশকারের কাছে ধন্না দিয়ে সে কাবুলীওয়ালার ছদ্মবেশ সংগ্রহ ক'রে এনেছিল। জ্বলন্ত চক্ষুর ভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল ফস্‌ফোরাস।

নামে এবং দেহে ভোঁদা হ'লেও বুদ্ধি তার মোটা ছিল না।